BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

মায়াকাননের ফুল

নবনীতা দেবসেনকে

লেখকের কথা

এই লেখাটি পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক-পাঠিকাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে। মনে হবে অজস্র ছাপার ভুল। আসলে ইচ্ছে করেই অনেক বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলো একটু একঘেয়ে। অনেক সময় সেগুলো বাদ দিলেও পুরো বাক্যের মানে বোঝা যায়। যেমন আমরা মুখের কথায় অনেক সময়।

লেখক খানিকটা বলে দিচ্ছেন বাকিটা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নেবেন। অর্থাৎ লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করছেন। এইভাবে, একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হতে পারে। তবে, বলাই বাহুল্য, এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোনো দাবি নাই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় যাব ? কোনো একটা নতুন জায়গায়।

যেতে হবে ট্রেনে। আগে থেকে টিকিট-ফিকিট কিছুই। ইচ্ছেই তো জাগল বিকেলে। সারা ট্রেনটি মানুষে জমজমাট। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে। কোনো কামরাতেই আর একজনও অতিরিক্ত মানুষের জায়গা হবে না। শুধু ফার্স্ট ক্লাসের বগিগুলো এখনো কিছু ফাঁকা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকি দেবার অভ্যেস থাকলেও ফার্স্ট ক্লাসে নেই। এরকম ঝুঁকি নিতে সাহস ঠিক।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট। যা হোক কিছু একটা করা।

স্টেশন থেকে কোনো দিন ফিরে যাইনি। শেষ মুহূর্তে যে-কোনো কামরায় লাফিয়ে উঠেও অন্তত।

শুনেছি, কাকে যেন ঘুষ দিলে থ্রি-টায়ার বা টু-টায়ার কামরায় টিকিট পাওয়া যায় যে-কোনো সময়ে। কিন্তু যাকে সেই ঘুষটা দিতে হবে তাকে খুঁজে বার করব কী উপায়ে ? ঘুষখোরদের কি মুখ দেখে চেনা যায় ? তাছাড়া ঘুষ দেবার সঠিক পন্থাটা কি ? টাকাটা কি আগে থেকেই বাড়িয়ে দিতে হয়, না ওরা নিজেরাই ? ওদের মধ্যে যে একটিমাত্র সৎলোক আছে, যদি আমি ঠিক তার সামনেই পড়ে যাই ? যদি সে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, আপনি আমাকে অপমান ?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি এ পর্যন্ত কখনো কারুকে ঘুষ দিইনি। কারুকে নিতেও দেখিনি। এমনকি, এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, এরকম একটা বড়ো শহরে, অথচ আমার চোখের সামনে একটাও মৃত্যু ঘটেনি, দুর্ঘটনাও না। আর সবাই দেখেছে, আমারই দেখা হয়নি। কোনো নিষ্ঠুর রমণী আমার চোখে পড়েনি। কত কী যে বাকি আছে।

—দাদা, আগুনটা

পাশ ফিরে দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ফর্সা চেহারার লোক, মুখে সিগারেট গোঁজা, হাতটা আমার সিগারেটের দিকে। লোকটির নাক ও চোখে স্পষ্ট মঙ্গোলীয় ছাপ। এমন হতে পারে, তিব্বতরাজ একবার যখন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীর কারুর সঙ্গে এদের পরিবারের রক্তের সংমিশ্রণ। এরকম হঠাৎ মনে আসে।

ধীরে সুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা। ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত লক্ষ রাখলাম লোকটির দিকে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অন্য কারুর কাছ থেকে আগুন চায়, সে নির্ঘাত কৃপণ। কেননা কাছেই দেশলাই কিনতে। এটাও আমার এক মুহূর্তের চিন্তা। পরে ভুল প্রমাণিত।

দেশলাইটা ফেরত দিয়ে লোকটি হনহন করে চলে গেল সামনের দিকে। ধুতি-পরা লোকের এত জোরে হাঁটা কি ঠিক?

বাচ্চাদের ঝুমঝুমির যে রকম আওয়াজ, স্টেশনের মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে সেই রকম একটা আওয়াজ সব সময়। তাছাড়া, একই সঙ্গে এখানে ব্যস্ততা ও মন্থরতা। বেঞ্চগুলোতে যারা জায়গা পেয়েছে তারা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেয়। গরম দেশে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও প্রকাশ্যে ঘুমোতে লজ্জা পায় না। এই সন্ধে বেলাতেও। আমার একটুও ভালো লাগে না এসব দেখতে।

জানলাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনো জানলার পাশে যদি কোনো সুন্দরী। যে-কোনো একটা কামরায় উঠতেই হবে, তখন মোটামুটি একটু চোখের আরাম যাতে সে রকম কেউ নেই। হঠাৎ নাকি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের গলার হার টেনে ছিঁড়ে নেয় আজকাল। মেয়েরা তাই ভেতরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আমার খুব কাছেই দুটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ নধর, পাকা হলুদ রঙের। লক্ষ্য রাখি, কলার খোসা ওরা কোথায়। ছেলেবেলায় বয়স্কাউট ছিলুম তো। কেউ প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তার ওপর ফেললে তার সামনেই তাকে অপমান করার জন্য আমি খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে পা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে।

ছেলে দুটির কলা খাওয়া এখনো শেষ হয়নি, এর আগেই একটা অন্যরকম দৃশ্য। ওদের সামনে দাঁড়ানো একটি ভিখিরি। বেশ বৃদ্ধ ও লম্বা। ওরা প্রথমে তার দিকে নজরই দেয় না। তারপর এক সময় বিরক্ত। একজন তার হাতের অতিরিক্ত একটি কলা বৃদ্ধটির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও!

এটা নতুন কিছু নয়। এর পরের টুকু।

ভিখিরিটি যেন ককড়ে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, না, না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনাদের মুখের গ্রাস।

—আরে নাও না, নাও না, বলছি তো।

—আমায় মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।

ভিখিরিটি দ্রুত সেখান থেকে পা চালিয়ে। আমি সেদিকে একটু চিন্তিতভাবে। অদ্ভুত তো! এই ঘটনাটা দেখে আমার কিছু একটা মনে হওয়া উচিত ছিল। চোখের সামনের যে-কোনো ঘটনা সম্পর্কেই হওয়া উচিত। আমরা তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে। এই ভিখিরিটিকে দেখে আমার খুশি হওয়া উচিত না বিরক্ত? ভদ্র ভিখিরি

হিসেবে এ অনন্য, কিংবা অন্য ভিখিরিদের চেয়েও অনেক বেশি বোকা?

তারপর হাসি পেল। ভিখিরিও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ

ঘণ্টা বাজল। এবার ট্রেন। আমি সোজা সামনের কামরার দিকেই পা বাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় সেই মঙ্গোলিয়ান মুখ ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

—কেন বলুন তো?

—একটা টিকিট আছে, এক্সট্রা...আমাদের একজন লাস্ট মোমেন্টেও এলো না।

—কোথাকার টিকিট?

—ডেহরি-অন-শোন... আপনি যা দাম দিতে চান, মানে আপনি যদি অতদূরে না যান...এখন তো আর ফেরত দেবার সময় নেই...

—আমি ডেহরি-অন-শোনেই যাব। কত টাকা দিতে হবে।

—আগে উঠে পড়ুন, উঠুন, গাড়ি এক্ষুনি।

লোকটি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। দরজার সামনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে সেই ভিখারিটা। কেউ কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, আরে বাবা, সরো, সরো—

আমি কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকে। আস্ত একটি বাঙ্ক আমার জন্য। টিকিট ও রিজার্ভেশন কার্ড হাতে দিয়ে লোকটি বলল, একেবারে ওপরেরটা। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, কিছু না।

—আপনি ডেহরি-অন-শোনেই যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

বস্তুত এইখান থেকেই গল্পের শুরু। ডেহরি-অন-শোনে আমার চেনা কেউ নেই, কোনোদিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবিইনি। একেবারে নিরুদ্দেশে কেউ বেরিয়ে পড়ে না, বিশেষত আমি পরীক্ষাতেও ফেল করিনি, প্রেমেও ব্যর্থ হই নি এখনো। মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম, সমীরের ওখানে যদি...খুব বেশি দূর নয়।

কিন্তু অত্যন্ত ভিড়ের ট্রেনে যদি কেউ আমাকে হঠাৎ একটা টিকিট দেয়, তবে আর সেখানে না যাওয়ার কোনো যুক্তি আমার নেই। ব্যাপারটাকে আরো যুক্তিযুক্ত করার জন্য আমি কাঁধের ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে, ফের দরজার কাছে এসে সেই লম্বা মতন ভিখিরিটিকে দশ পয়সা। সে যখন নমস্কার করতে

আসে, আমি লক্ষ্য করি, তার ডান হাতে ছটা আঙুল।

মঙ্গোলিয়ান-মুখ লোকটির নাম অরবিন্দ ভৌমিক। তার বন্ধুর আসার কথা ছিল, কেন আসতে পারেনি, সেজন্য ঈষৎ দুশ্চিন্তিত মুখে আমায় প্রশ্ন করল, বলতে পারেন, বেলেঘাটার দিকে আজ কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

এটা আমি সত্যিই জানি যে সকালবেলা বেলেঘাটায় একজন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছে। দুপুরবেলা রেডিওতে।

—আপনার বন্ধুর নাম কি?

—অশেষ মজুমদার, চিনতে পারবেন বোধ হয়, জাস্টিস চন্দ্রভূষণ মজুমদার—যিনি আবার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে...তাঁর মেজো ছেলে...আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড।

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আবার বলল, অশেষ কোনোদিন কথা দিয়ে ফেইল করে না। যাক গে, আপনাকে কিন্তু ট্রেনে এই নামেই, মানে, চেকার যদি আসে—নাম জিজ্ঞেস করে না অবশ্য, তবু যদি, আপনি তা হলে ঐ নামটা—

—কোন নাম?

—আমার বন্ধুর নাম যা বললাম।

এমনও হতে পারে, অশেষ মজুমদারই আজ বেলেঘাটায়। রেডিওতে যেন ঐ রকমই একটা নাম। ট্রেনে আমাকে ঐ নামেই। কিন্তু অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বয়েসের তফাতের জন্যই—

চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় কেউ বুকের কাছে জামার হাপর দিয়ে ঘাম শুকোবার। বাইরে আলো অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেই ওপরের বাঙ্কে উঠে বসা চলে না, রাত মাত্র আটটা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে ঘুমের তোড়জোড়।

অরবিন্দ ভৌমিক একা নয়, তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। তিনি উল্টো দিকে চক্ষু বুজে। অরবিন্দ ভৌমিক বলল, মা, তুমি একটু এদিকে এসে বসো তো—ওনাকে একটু বসার।

একজন মাসিক পত্রিকা পাঠরত যুবকের পাশে আমি এসে। তারপর পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে। সামান্য খুচরো সাত পয়সার হিসেব মেলানো যায় না। সে বলল, ঠিক আছে।

আমি সেটা মানতে রাজি নই। ভিখিরিটিকে দশ পয়সা না দিলে ঠিকই হিসেব মিলে যেত—একথা অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে। সে-কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, কাল সকালে।

—আপনি আচ্ছা লোক তো—মোটে সাতটা পয়সা।

সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলেই একটা দেশলাই কেনা যায়। আমি পকেট

থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই ফের হাত সরিয়ে। ওর মায়ের সামনে।

কিন্তু ওর মায়ের সামনে কি আমি সিগারেট খেতে পারি? মনস্থির করতে পারি না। বৃদ্ধা যখন সরু চোখে আমারই হাতের দিকে। আমি ম্যাজিসিয়ানের কায়দায় সিগারেট দেশলাই লুকিয়ে। একটা অস্বস্তি।

আমার পাশের যুবকটি অন্যমনস্কভাবে ফস করে সিগারেট জ্বালিয়েই ধোঁয়া ছাড়ল সোজা সামনে। এর কোনো বাধা নেই। এ তো অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধুর টিকিটে যাচ্ছে না!

এবার কামরাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে। আমাদের কিউবিকলে ছ'জন মানুষের মধ্যে বাকি দু'জন: একজন বছর তিরিশেক বয়েসের বউ ও একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ফ্রক পরা মেয়ে। এদের আমি আগেই দেখেছি, কিন্তু সরাসরি চোখের দিকে তাকাইনি। এখন আমরা সহযাত্রী, এখন কোনো বাধা নেই।

—আপনি ডেহরি-অন-শোনে কোথায় যাবেন?

এর উত্তর আমি একটু আগেই ভেবে ঠিক করে। আলগাভাবে বললাম, ওখান থেকে আবার ট্রেন বদলাবো।

—কোনদিকে? ডাল্টনগঞ্জের দিকে?

যেন ঐ সব অঞ্চল আমার কতই চেনা, এই ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ি। তারপর ব্যস্তভাবে বলি, একটু আসছি।

অরবিন্দ ভৌমিক আমার বন্ধু নয়, আমার অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তবু যেন কেন আমার একটু কৃতজ্ঞ ভাব। একটা টিকিট দিয়েছে বলে? টিকিটটা ওর নষ্ট হতোই। কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের অত ভিড়ের মধ্যে শুধু আমাকেই নির্বাচন।

অকারণেই একবার বাথরুমের দিকে ঘুরে ফিরে। অন্যান্য কিউবিকলের যাত্রীরা এরই মধ্যে বিছানাপত্র গোছাতে ব্যস্ত, মাত্র আটটা বেজে পনেরো কুড়ি। অনেকে খাবারের কৌটো খুলে। চারজন যুবক তাস খেলায়। সমস্ত কামরাটি ঘুরে এসে আমি একটি কালো সিল্কের বোরখা পরা, ইদানীং মুখটুকু খোলা, মুসলমান রমণীকেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আখ্যা দিই। আমাদের জায়গাটা থেকে সে অনেকটা দূরে। ভোরবেলা উঠেই এঁর মুখদর্শন করতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতেই মনে পড়ল, সারা রাত কি এই জন্য আমাকে বার বার উঠে আসতে হবে? সিগারেট ছাড়া তো আমি বেশিক্ষণ। তা ছাড়া এত হাওয়ায় সিগারেট ঠিক জমে না।

চাঁদের হালকা ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। অসুন্দর শহরতলিও এখন একটু

একটু রহস্যময়। বিশেষত খাল বা পুকুরের জল যখন অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে ওঠে। জলের প্রতি আমার বড়ো বেশি টান। অচেনা জল দেখলেই ভালোবাসতে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শৈশব।

মনে হয়, জলের ওপাশে ঐ যে প্রান্তর, যেখানে অন্ধকার আরো গাঢ়, সেখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গ হয়তো। তার ওপাশেই স্বর্গ। এসব ছেলেবেলার কথা। পকেটে সব সময় একটা গুলিসুতোর ডিম থাকত, যদি কখনো সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়—

ফিরে এসে দেখলাম, সকলে বিছানা পেতে ঠিকঠাক। মাসিক পত্রিকা হাতে যুবকটি বলল, আপনি বসবেন তো বসুন না—

তাহলে ওদের বিছানার ওপরেই বসতে হয়। বিছানাটি বধূটির। ইংরেজ-ভদ্রতার সঙ্গে বলি, না, না, আমি ওপরেই।

একদম নিচের দুটি বাঙ্কে মহিলা ও বৃদ্ধা। মাঝখানের দুটিতে কিশোরী ও মাসিক পত্রিকা। আমার ওপাশে অরবিন্দ ভৌমিক।

চটি খুলে ওপরে আগে রেখে তারপর কসরৎ করে ওঠা। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেই অরবিন্দ ভৌমিক বলল, আপনি বিছানা আনেননি?

আমি আরো কী কী আনিনি তার একটি তালিকা তক্ষুনি শুনিয়ে দেওয়া উচিত। তার বদলে একটু সাদামাটা হাসির সঙ্গে জানালাম, না, দরকার হয় না।

—আমার সঙ্গে একটা এক্সট্রা বালিশ আর চাদর আছে।

অনেক মানুষই বোঝে না যে অপরের কাছ থেকে কোনোরকম দয়া বা সাহায্য নেওয়া কারুর কারুব পক্ষে কি রকম অস্বস্তিকর। আমি আপন মনে থাকতেই বেশি।

—না। সত্যিই কোনো দরকার নেই।

—আবে নিন না। শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?

নিতেই হলো। অপরের চাদর ও বালিশে কি রকম যেন অন্য লোক অন্য লোক গন্ধ। যদিও হোটেল কিংবা ডাকবাংলোতে একথা মনে হয় না। ধন্যবাদ বলার বদলে আমার মুখটা আড়ষ্ট হয়ে। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স খালি হয়ে গেছে। সেটা অ্যাশট্রে হিসেবে। এখানে সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার বেশ আরাম বোধ। ট্রেনে শুয়ে শুয়ে যাওয়া কী সৌভাগ্য। এখানে প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ মাপের শোওয়ার জায়গা। অতিরিক্ত মাত্র সাড়ে চার টাকা। অন্য কামরাগুলোতে বহুলোক দাঁড়িয়ে। অনেকে দু'পায়ের উপর সমান ভার রাখতেও পারেনি।

কোনো নতুন জায়গায় যাওয়ার আগেই সেই জায়গাটা কল্পনায় দেখে নেওয়া

আমার অভ্যেস। ডেহরি-অন-শোন জায়গাটা কেমন? স্টেশনের ওপর দিয়ে অনেকবার গেছি কিন্তু কোনো বারই। এখন কেনই বা আমি যাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, জায়গাটা কী রকম? স্টেশনের পাশেই একটা বিশাল গুলমোহর গাছ। ব্রীজের গা দিয়ে নদীতে নামার জন্য সিমেন্টের সিঁড়ি। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি মারাত্মক রকম ভাঙা। সিঁড়িতে সামান্য রক্তের দাগ। আমি স্পষ্ট দেখতে। শুকনো রক্ত। একদল ছেলে দুপদাপ করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জানতে হবে তো রক্তের ছোপটা কিসের।

কিশোরী মেয়েটি এর মধ্যে ঘুমিয়ে। অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে গেলে আমাকে ওরই দিকে তাকাতে।

একটা ব্যাপাবে খটকা লাগে। অরবিন্দ ভৌমিক যাচ্ছে তার মায়ের সঙ্গে, আর এক বন্ধুব আসার কথা ছিল। কি রকম যেন অদ্ভুত কম্বিনেশন। মাসিক পত্রিকা-পড়া যুবকটির সঙ্গে বিবাহিতা মহিলা ও কিশোরীটির সম্পর্ক কি? মহিলাটি ও যুবকটি ভাই বোন? এরা এত কম কথা বলে কেন। কিশোরী মেয়েটি, বিশেষত, কি দারুণ গম্ভীর। ট্রেন যাত্রার চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই। এই বয়েসের সকলেই তো। হোক না অচেনা, তবু ঠিকঠাক সম্পর্ক না মিললে মনটা কীরকম যেন অপ্রসন্ন হয়ে।

কি একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তুমুল হৈহৈ। বহুলোক জোর করে কামরায়। শুয়ে-থাকা মানুষগুলো চিৎকার করে উঠল, দরজা দরজা। কেউ নিজে থেকে উঠছে না। কামরা প্রায় ভরে গেছে বাইরের লোকে। তখন শুয়ে থাকা মানুষের হুকুম, এই নিকালো, নিকালো, দেখতা নেই হ্যায়, রিজার্ভ কম্পার্ট—

—কে দরজা খুলেছে কে? দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয়নি? অ্যা?

আমি চোরের মতন গুটিশুটি মেরে চুপচাপ। শেষবার আমিই সিগারেট খাবার সময় দরজা খোলা রেখে। কেউ কি টের পেয়েছে যে আমিই?

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাচামেচি ও হল্লা। যারা উঠে এসেছে তারা কেউ নামবে না। তাদেরও তো যেতেই। কন্ডাকটর গার্ড উধাও। বচসা চলতে চলতেই ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে। তখন আদি যাত্রীরা যে-যার নিজের বাঙ্কে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়, যাতে আর একটুও জায়গা না থাকে, আর কেউ সেখানে বসতে।

ফর্সা জামাকাপড় পরা নবাগতরা দাঁড়িয়েই থাকে, তাদের মুখমণ্ডলে অভিমান ও রাগ। অন্যরা মেঝেতেই। আমার ঠিক চোখের নিচেই এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি, এদের কাপড় যদিও অত্যন্ত পরিষ্কার, তবু এরা মেঝেতেই এবং মুখে কোনো অভিমান নেই। দুটি পুঁটলির ওপর ওরা দু'জন। ওদের মুখের দিকে

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। যেন বিহ্বলতার সমুদ্র থেকে এই মাত্র স্নান করে এসেছে।

অরবিন্দ ভৌমিক মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ঘুমের দফা গয়া। মালপত্তরের ওপর নজর রাখতে হবে, বুঝলেন! কত চোর ছ্যাঁচোড় আছে এর মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিশোরী মেয়েটি এখন জেগে। সম্পূর্ণ খোলা চোখ, তার ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব। এই বয়েসে হয়। এত হৈচৈ-এর মধ্যেও ও একটিও কথা বলেনি।

মেয়েটির নাম কি?

আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই স্বল্পবাক কিশোরীটির একটি নাম না দিলে, এর চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। হলুদ রঙের স্কার্টের বদলে যদি ও শালোয়ার কামিজ পরে থাকত, তা হলে আমি যেমন ওকে অগ্রাহ্য।

বার বার ওর দিকেই আমার চোখ। শুধু ওর রূপের জন্যই নয়। ওর নীরবতা। এই বয়েসের সব মেয়েরই শরীরে একটা হঠাৎ-আসা লাবণ্য বড়ো উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর রূপ তার চেয়েও কিছু বেশি। কিন্তু এই বয়েসটা তো উচ্ছলতারও। ও কেন এত চুপ?

চোখ বুজে মেয়েটির একটা নাম বসাবার চেষ্টা করছি এমন সময় কান্নার শব্দ। চমকে নিচের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি না। কে? কোন দিকে? তারপর শব্দ অনুসরণ করে। কিশোরী মেয়েটিই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মধ্যের যুবকটি হাত বাড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, রমু, কি হয়েছে?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে দেয়। যুবকটি আবার বলে, এই রমু, কি হয়েছে?

বুঝতে পারি সমস্ত কামরা উৎকর্ণ হয়ে আছে মেয়েটির উত্তর শোনার জন্য। একতলার বধূটিও উঠে দাঁড়িয়ে।

অতি ব্যস্ততায় আমার এক পাটি চটি পড়ে গেল নিচে। সাঁওতাল যুবকটির গায়ের ওপরে।

সাঁওতাল যুবকটি তার সুন্দর বড়ো চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। তাতে বিস্ময় কিংবা বিরক্তি আছে বোঝা যায় না।

আমি মরমে মরে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বলি, ভাই, কিছু মনে করো না।

চটিটা আমার হাতের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওর গায়েই। ছি ছি। এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য আমি সেই মুহূর্তে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি নিচে নামবার আগেই সাঁওতাল যুবকটি আমার চটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে আমি আরো বেশি লজ্জিত বোধ। অপরের জুতো হাতে নেওয়া মোটেই সুচারু ব্যাপার নয়। কেন ও আমার জুতো। আমি ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলি, ভাই, কিছু মনে করোনি তো!

এ কথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না। এ সব ভদ্রলোকি ভাষা। যেমন আমি ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছি। কাল সকাল থেকে আমি ওকে আপনি।

ঠিক। অনেক কিছুই কাল থেকে শুরু করব, এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার বহুদিনের দুর্বলতা।

আমার নিচের বাঙ্কের যুবকটি ওকে একটু ঠ্যালা মেরে বলল, এই, একটু হঠ যাও তো!

তারপর কিশোরী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, এই রমু, তোর কি হয়েছে? বল না কি হয়েছে?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে এখন নীরব। অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে ভয় বা দুঃখ পেয়ে এ রকম কান্না। কিন্তু মেয়েটি তো জেগেই। এক মিনিট আগেই দেখেছি। ওর খোলা চোখ। ওর এখনকার নীরবতাই আরো বেশি কৌতূহল উদ্দীপক।

—রমু, কাঁদছিস কেন?

মেয়েটি এবার বলল, কিছু না। তারপর সে অন্যদিকে মুখ। এই সময় ট্রেন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়, বিরাট শব্দ। যেন সমস্ত লৌহসভ্যতার তারস্বরে চীৎকার।

—তোর পেট ব্যথা করছে?

—না

—তাহলে কাঁদছিস কেন?

একতলার বাঙ্কের মহিলাটি উঠে এসে শান্ত হুকুমের সুরে বললেন, কি হয়েছে আমাকে বল তো।

—কিছুই হয়নি বলছি তো!

—আমার দিকে মুখ ফেরা।

কিশোরী মেয়েটি মুখ ফেরাল। তখনো তার চোখের দু'পাশে অশ্রুরেখা। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। এই চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটির কি এমন দুঃখ, যাতে রাত্রে ট্রেনের কামরায় একা একা সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, এই দুঃখের অতলতা আমি ছুঁতে পারব না। আমি সতর্ক হয়ে রুমাল। অন্য কারুর কান্না দেখলে হঠাৎ আমারও চোখে।

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, যদি পেট-টেট ব্যথা করে...আমার কাছে ওষুধ আছে।

দেখা যাচ্ছে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এর কাছে অনেক কিছুই মজুত। অবশ্য ওর কথায় কেউই ভ্রূক্ষেপ। মহিলাটি মৃদু ধমকের সুরে মেয়েটিকে বললেন, ছিঃ, এরকম কোরো না!

যুবকটি ও মহিলাটি দু'জনেই গম্ভীর। খুব একটা ব্যস্ততা বা উদ্বেগের চিহ্ন তো। ভেবেছিলাম ওঁরা মেয়েটির হঠাৎ কেঁদে ওঠার কারণ জানার জন্য। কিন্তু এখন মহিলাটি বললেন, কেঁদে কী হবে? ওরকম ভাবে কাঁদতে নেই!

মেয়েটি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বলল, ঠিক আছে, তোমরা শোও।

মহিলাটি চলে গেলেন নিজের বিছানায়। যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে। সমস্ত কামরার লোক যে ওদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, এটা জেনে সে একটু বিব্রত। ফস করে একটা সিগারেট জ্বেলে সে বলল, রমু, ঘুমিয়ে পড়—

যেন ঘুমটা কারুর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তার গাম্ভীর্য ও কান্না, এই দুটি মিলিয়েই এই কিশোরী মেয়েটিকে বেশ খানিকটা উঁচু করে।

অরবিন্দ ভৌমিকের নাক সশব্দে। কামরায় হুড়হুড় করে অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়ায় ও বলেছিল, চোর ছ্যাচোড় থাকতে পারে। সারা রাত জেগে নজর রাখতে হবে।

কিশোরী মেয়েটি চিত হয়ে শুয়ে। হাত দুটি আড়াআড়ি করে চোখের ওপরে। কান্না লুকোবার জন্য কিংবা আলো আড়াল করার জন্য, কে জানে। আমি ওর পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তন্ন তন্ন করে। পায়ের নখে রক্তকুঙ্কুম। পরিচ্ছন্ন গোড়ালি। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তার সুডৌল পায়ের গোছ দেখে সাহেবরা প্রশংসা করত। হলুদ রঙের স্কার্ট। কোমরে একটা বেল্টের মতন স্ট্র্যাপ থাকায় কোমরটি যথেষ্ট সরু দেখায়। তার বুকের স্বাস্থ্য ভালো। তার গলা দেখলে টিনকাটা মাখনের কথা মনে আসবেই। ধারালো চিবুকে খানিকটা জেদী ভাব। ঠোঁটে যেন লেগে আছে অভিমান। কিংবা ওটা আমার কল্পনা। রমু। ওর পুরো নাম কি? রমা কিংবা রমলা নাম তো ওকে মানায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও এখনো ঘুমোয়নি। কি ওর দুঃখ?

পাশের কিউবিকলে কিসের যেন বাগবিতণ্ডা। উৎকর্ণ হই। নতুন কিছু না, জায়গা দখলের লড়াই। আমাদের এদিকে নিচের দুটি বাঙ্কেই স্ত্রীলোক বলে কেউ জোর করে বসতে আসেনি। অন্য জায়গায় ছাড়বে কেন? এদিকের মেঝেতে

সাঁওতাল দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে এখন সবাই মোটামুটি মালপত্রের ওপর একটা না একটা বসার জায়গা।

পুটলি থেকে খাবার বার করে সাঁওতাল দম্পতি এখন ডিনার সেরে নিচ্ছে। কয়েকটা লাড্ডু। ইঁটের মতন শক্ত চেহারা। সেগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে খুব নিম্ন স্বরে কথা। আগে লক্ষ্য করিনি, মেয়েটি গর্ভবতী। তাই ওর চোখে মুখে এত অলস লাবণ্য। আমি লোভীর মতন ওদের খাওয়া। আমার খিদে পায়নি, শুধু দেখতে ভালো লাগছে এমন! পরের জন্মে আমি সাঁওতাল হবো। এই রকম গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় মেঝেতে বসে লাড্ডু খাব।

ট্রেনে আমার সহজে ঘুম আসে না। যদি জানলার কাছে বসার জায়গা একটা! অন্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আর একবার কিশোরীটির দিকে। কি জানি বোঝা যায় না। নিশ্বাসের স্পন্দনে তার বুক উঠছে নামছে না। কি সুন্দর এই বয়েস, যেন সবেমাত্র ভোর হলো। ভোরবেলার মতন একটি কিশোরী পা ফেলে আসছে যৌবনের দিকে। একমাত্র তাকেই মানায়, আমি বললুম সুন্দর, তাই এ পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠল। তবু সে একা আপন মনে কেঁদে ওঠে কেন? আর কিছু না, তার ঐ রহস্যটার জন্যেই তার খুব কাছাকাছি যেতে।

খুব সাবধানে বাঙ্ক থেকে নিচে। চটি জোড়াটা হাতে। আমি চলে এলাম বাথরুমের দিকে। এখানে মেঝেতে অনেক লোকজন বসে আছে। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে বাথরুমে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার।

একটু বিরক্তভাবে আমি বললাম, অন্য কোনো কামরায় আর জায়গা নেই?

একজন বিদ্রূপের সুরে বলল, তাহলে আর এখানে এসেছি কেন, এখানে কি বেশি মধু আছে। আপনি শোওয়ার জায়গা পেয়েছেন, শুয়ে থাকুন না।

শুধু শুধু এদের কাছে ধমক। কী দরকার ছিল আমার মাথা ঘামাবার। সত্যিই তো অন্য কামরায় জায়গা থাকলে কেনই বা এখানকার মেঝেতে। আমরা অনেক সময় জেনেশুনেও এরকম অবাস্তব প্রশ্ন।

আমি বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই আর একজন বলল, ভেতরে লোক আছে।

অগত্যা একটা সিগারেট। আমার বিদ্রূপকারীই ফস করে হাত বাড়িয়ে বলল, একটু আগুনটা।

লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে। এই রকম রোগা লোকরা বেশির ভাগ সময়ে রেগে থাকে। শারীরিক শক্তির অভাবটা কণ্ঠস্বর দিয়ে।

—কত দূর যাবেন?

—আর দুটো স্টেশন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি উৎসুকভাবে তাকাই। লিকলিকে ছেলেটি সিগারেটটা গাঁজার কল্কির স্টাইলে ধরেছে আঙুলের ফাঁকে। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। প্রশ্ন করল, আপনি কি রাজবল্লভপাড়ায় থাকেন?

—না তো।

—আপনার দাদা এরিয়ান্স ক্লাবে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলে না?

—না, আপনি ভুল করেছেন।

—কিন্তু আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে।

ছেলেটির দুটি তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে ও অন্য কারুর সঙ্গে। এরকম আমার প্রায়ই হয়। আমার চেহারা এতই সাধারণ যে অনেকেই ভাবে, আগে কোথাও।

তখন মনে পড়ল, আমি অশেষ মজুমদারের টিকিটে। ইচ্ছে হলো এই কৌতূহলী ছেলেটিকে বলি, আমার নাম অশেষ মজুমদার, আমি খুব সম্ভবত আজ সকালেই বেলেঘাটায় নিহত হয়েছি!

এই কৌতুক আমি নিজেই মনে মনে উপভোগ। ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে আমি ওকে জানাই, আমার কোনো দাদা নেই। রাজবল্লভপাড়ার নাম শুনেছি বটে, কখনো যাইনি। আপনি আমাকে দেখে থাকতে পারেন।

—কোথায় বলুন তো, কোথায় বলুন তো—

—কার্জন পার্কে। ওখানে আমি ম্যাজিক দেখাই।

ছেলেটি সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে। তারপর বলে, ট্রেন লেট করবে মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দরজা এই সময় খোলে।

ফিরে এসে আমি আবার আমার বাঙ্কে। বইটা খুললাম। তারপরেই তাকালাম পাশে। কিশোরী মেয়েটি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটি খোলা। সেখানে নিঃশব্দে অশ্রু। আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করি। কেন একটি মেয়ে একা একা শুয়ে কাঁদবে? ওর সঙ্গের পুরুষ ও মহিলাটি এখন ঘুমন্ত। আমি ওর অচেনা, আমি তো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। যদি আর একটু ছোট হতো, যদি খুকি বলে সম্বোধন করা যেত। কিন্তু এখন ওর বিপজ্জনক বয়েস, অচেনা লোকের বেশি কৌতূহল কেউ সুনজরে দেখে না।

মেয়েটি পাশ ফিরল। মনে হয় ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টায়। কিংবা এটা আমার দেখার ভুল। কাঁপছে না। কেউ যদি স্নেহময় হাত ওর মাথায় বুলিয়ে এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে।

আমি কতদিন কাঁদিনি। বই পড়তে পড়তে কিংবা সিনেমা দেখার সময় প্রায়ই

আমার চোখে জল আসে। সে অন্য। নিজের কোনো দুঃখে? মনে পড়ে না।

বইটা চোখের সামনে মেলা, আমি পড়ছি না। আমার সমস্ত কৌতূহল ঐ মেয়েটির দিকে। ও এখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমার ঐ রকম বয়েসে, সদ্য স্কুল থেকে কলেজে, তখন আমি ম্যাজিসিয়ান হবার স্বপ্ন! ম্যাজিসিয়ান হয়ে দেশ-বিদেশে। পি সি সরকারের বই নিয়ে হিপনটিজম। যাদুসম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী ভোরবেলা ছাদে উঠে দূরের সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টে। ওতে চোখের জোর বাড়ে। শ্রেণীবদ্ধ নারকেল গাছগুলির পাশেই যে বাড়ি তার ছাদে একটি মেয়ে হাতে একখানি বই নিয়ে গোল হয়ে ঘুরত। ভোরবেলা ঘুরে ঘুরে পড়া মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল তার। এবং আসলে সে-ই জানত ম্যাজিক। অবিলম্বে সে আমাকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে।

এর চার পাঁচ বছর বাদে নন্দিতা যখন সুশোভনকে বিয়ে করতে চায়, এবং আমাকে জানায়, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি দাতা কর্ণের চেয়ে বড়ো। আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি, এমনকি আমার প্রেমিকাকেও। একদিন মাত্র আমি কথার ছলে সুশোভনের সামান্য নিন্দে করেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করে। আমি এত নিচে নামতে পারি না। পৃথিবীতে আর যাকেই হোক, সুশোভনকে কোনোদিন নিন্দে করার অধিকার আমার নেই। সে আমার প্রেমিকার স্বামী। সে চিরকালের সম্মান পাবে।

ট্রেন কোনো একটা স্টেশনে যেন। অস্পষ্ট শব্দ। ট্রেন কি অনেকক্ষণ থেমে আছে? এখন কত রাত? না, আবার চলছে...

নন্দিতার বিশেষ সাধ ছিল কোনো একদিন আমার সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায়। তারপর যখন ও নিজেই যায় আমি তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়...একদিন একটা সাপ...

তন্দ্রার মতো এসেছিল। মনে হয় যেন এক মুহূর্ত আগে চোখ বুজেছি, আসলে বেশ কিছুক্ষণ। বইটা পাশে ঝুলছে, আর একটু হলেই। বইটা তুলতে গিয়ে চোখ পড়ল। মেয়েটি তার জায়গায় নেই। কোথায় গেল? রাত প্রায় দুটো। আমি ওর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শূন্য বাঙ্কটার দিকে চোখ। সারা কামরা ঘুমন্ত। আমারও আবার ঘুম-ঘুম আসছিল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে না এলে। এটা যেন আমারই দায়িত্ব।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই। এতক্ষণ কি করছে ও? বাথরুমের দরজা বন্ধ? এত রাত্রে ও যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি বাধা দেবার কে?

আমি আবার ঘুমোবার। চোখ বুজলেই একটা হালকা লাল রঙের আভা। চোখের ওপরেই আলো। পাশ ফিরলাম। এবারে বেশ মনোমতন অন্ধকার। যেন

একটা ঘন জঙ্গল। প্রত্যেকদিন এই জঙ্গলটাকে দেখি। একদিন আমি ওখানে। হঠাৎ মনে হয় কোনো একটা জরুরি জিনিস বোধ হয় বাড়িতে ফেলে। কি? টাকা, টুথব্রাশ, একটা ডটপেন, পাজামা, তোয়ালে—আর কি লাগতে পারে? আগামীকাল কি কারুর সঙ্গে দেখা করার। কিছু যেন একটা ভুল হয়ে। পেছনে, কলকাতায় ফেলে এসেছি কোনো ভুল। কাল সকালে যদি মনে পড়ে, তখন অন্তত আড়াইশো মাইল।

মাস তিনেক আগে, যখন আসামে গিয়েছিলাম, শিলচর থেকে ডিমাপুর যাবার পথে, কি যেন স্টেশনের নামটা, কি যেন, ওরাং...না না, ডিগ্রিভ...না না, লালডেঙ্গা... না না, মনে পড়েছে, হারাংগাজাও, কি চমৎকার নাম, যেন আমার পূর্বজন্মের জন্মস্থান, সেখানে, যেন, সেখানে একজন খুনে ডাকাত, হাতে হাতকড়া, আমাকে বলেছিল, আমাকে, পাশেই দাঁড়ানো দুটি পাহাড়ী তরুণী, তারা...

ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সত্যিই ঘুমিয়ে। এরকম উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে দেখলাম, ওদিকের দ্বিতীয় বাঙ্কটা তখনো ফাঁকা। মেয়েটি গেল কোথায়? এতক্ষণ।

খুব ব্যস্ত হয়ে আমি নেমে। ওর সঙ্গী যুবক ও মহিলাটি নিশ্চিন্ত ঘুমে। আমি প্রথমেই যাচ্ছিলাম বাথরুমের দিকে। তার দরজাটা খোলা। ঢকাস ঢকাস শব্দ হচ্ছে, তবু আমি একবার তার ভেতরে উঁকি।

মেঝেতে অনেক লোক বসেছিল, এখন একজনও নেই। মাঝখানের কোন স্টেশনে নিশ্চয়ই সবাই। খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, হ্যান্ডেল ধরে, বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে।

আমি থমকে একটু দূরে। মেয়েটি যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে চায়, তা হলে আমার আপত্তি করার কি আছে? বিশেষত অচেনা মেয়ে। কিন্তু যে মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে একা একা কাঁদছিল, সে যদি চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজায়। আমি মনস্থির করতে পারি না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়ালে বিপদের স্পর্শ আছে, গুরুজনরা বকে, কিন্তু ঐ বয়েসে আমিও।

একটু দূরে আমি বিসদৃশ। অন্য সবাই ঘুমিয়ে, আমি একটি কিশোরী মেয়ের কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি। খুব সহজভাবে যদি ওর সঙ্গে ভাব করা যায়, সেটাই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কখনো সহজ হতে পারি না।

হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটি বুঝি আরও ঝুঁকছে সামনের দিকে। হ্যান্ডেল ছেড়ে দেবে। আমি দৌড়ে এসে।

এই রকম সময়ে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কম্পন হয়। বাতাস লাফিয়ে

ওঠে, তোলপাড় শুরু হয়, যেন এক্ষুনি দম বন্ধ। আমি পৌঁছোবার আগেই যদি মেয়েটি—

দরজা থেকে সে অনেকটা ঝুঁকে ছিল, আমি দ্রুত এসে তার একটা হাত। সে বোধহয় টের পায়নি আমার উপস্থিতি আগে। তবু কোনো চমক ফোটেনি তার চোখে। সে তার নীরব মুখ আমার দিকে।

আমি ব্যস্তভাবে বলি, কি হচ্ছে কি?

মেয়েটি বলল, কি?

—এখানে,...দরজার সামনে...এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—এমনিই ...কেন?

হয়তো সবটাই আমার ভুল। অতিরিক্ত কল্পনা। অন্যের জীবনের যে-কোনো ঘটনাই আমি নাটকীয়ভাবে দেখতে। নাটকীয় শব্দটা স্বাভাবিক নয় এই অর্থেই কেন যে আমরা। অথচ কত নাটক জীবনের মতনই স্বাভাবিক।

মেয়েটির বদলে আমিই লজ্জা। আত্মহত্যায় উদ্যত একটি কিশোরীকে হঠাৎ রক্ষা করায় আমার গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আত্মহত্যার কোনো চিন্তাই ওর মনে না এসে থাকে, এমনিই দরজার কাছে।

আমার লজ্জাকে আমি ঈষৎ দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে বলি, এত রাত্রে দরজার কাছে, এই সময় দরজা খোলা রাখা।

—কেন, তাতে কি হয়েছে?

আমি আগেই তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় সে সম্পূর্ণ আমার দিকে ফেরে। তার ভুরুতে একটু রাগের চিহ্ন।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বললাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম।

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো, রাত দুপুরে কোনো কিশোরীর হাত ধরে এটা ক্ষমা চাইবার ভাষা নয়। এ অন্যরকম ভাষা। এক এক সময়, আমি যে ভালো, এটা প্রমাণ করাই কত যে শক্ত হয়ে ওঠে।

অগৌণে নিজেকে শুধরে নিয়ে আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, দরজা খোলা দেখে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল, আমার ঘুম আসছিল না, খুব গরম।

—তবু এখানে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—হঠাৎ ঝাকুনিতে অনেক সময় বিপদ হয়। আমি তোমার জন্য ভয়...

—আমার জন্য? কিসের ভয়? আপনি কেন আমার জন্য ভয় পাবেন?

—বাঃ, এ রকম অবস্থায় যে-কেউ...সত্যিই তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম,

তুমি এতখানি ঝুঁকে...

—আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া আমি মরে গেলেই বা কার কি আসে যায়!

কৈশোরের এই অভিমান কি অপূর্ব সুশ্রী। একমাত্র এই বয়েসটাই পারে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে তোমার বন্ধু করে নেবে? আমাকে তোমার গোপন কথা?

কিন্তু প্রকাশ্যে অচেনা কারুকে এরকমভাবে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

যেন সে নাম জানাতে চায় না, এই রকম মুখের ভঙ্গি! একটু ইতস্তত। তারপর বাইরেব দিকে মুখ ফিবিয়ে, যেন হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, অনুরাধা বসুমল্লিক।

ওর ডাকনাম রমু শুনে আমি ভেবেছিলাম, ওর নাম রমলা বা রমা এই ধরনেব। সব সময় এই অনুমান খাটে না। তবে, অনুরাধা নামটিও ওকে মানায় নি। অনুরাধা নামে যে আর দুটি মেয়েকে আমি চিনি, তারা বেশ নরম ও শান্ত। তারা মাঝরাতে একা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াবে না।

—তুমি এবার শুতে যাও।

—যাচ্ছি।

সত্যিই সে যখন ফিরে যেতে লাগল তার বাঙ্কের দিকে, তখন আমি বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাক একটা কথা...তুমি কাদছিলে কেন!

মেয়েটি স্থির হয়ে দাড়াল। সোজাসুজি তাকাল আমার মুখের দিকে। অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় সেই বালিকা তেজের সঙ্গে বলল, আমি বলব না। কেন সবাই জানতে চায়?

আমি আমার প্রাপ্য পেয়েছি। অন্যায্য কৌতূহলের জন্য। মেয়েটির চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো হয়েও আমি অপবাধীর মতন নতমস্তকে।

সে তবু দাড়িয়েই রইল। যেন আমাকে আরো শাস্তি। হ্যা, আরো শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি একজনের পবিত্র গোপনকে উচ্ছিষ্ট করতে। অন্য কেউ যদি এরকমভাবে আমার। অবশ্য কান্না অনেক প্রশ্ন আনে। আনবেই।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে, যেন আমার ওপরে দয়া করেই বলল, আমার খুব চেনা একজন পরশুদিন মারা গেছে।

আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা একা তা বেশিক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টেব। আমি চুপ করে।

—আজ তাকে পোড়াবার কথা। হয়তো এতক্ষণে—

তক্ষুনি সব ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দুটি মাত্র কারণেই শুধু মৃত্যুর দু'দিন পর কাকুকে পোড়াবার ব্যবস্থা হয়। আত্মহত্যা অথবা খুন। এ ক্ষেত্রে যে কোনটা, তাও বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরে দুঃখের সঙ্গে ক্রোধ মিশে থাকার জন্য। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। মেয়েটিকে ওর আত্মীয়স্বজন জোর করে দূরে কোথাও। এই জন্যই সকলে এত গম্ভীর।

আমি বললাম, কে মেরেছে? পুলিশ?

—হ্যাঁ।

—ওর নাম কি?

—ওর নাম...না, বলব না, আপনি কে? কেন এইসব কথা জানতে চাইছেন? আপনার কি আসে যায়?

ডিটেকটিভ, স্কুলমাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই মানুষের চরিত্র সব চেয়ে ভালো বোঝে, কে যেন বলেছিলেন এই কথা? স্কুলমাস্টাররা বছরের পর বছর এত শিশুকে বড়ো হয়ে উঠতে দেখে যে মানুষের মোটামুটি সবকটা টাইপ তার জানা। ডিটেকটিভ আর লেখকরা বেশি উঁকি দেয় মানুষের গোপন জীবনে। বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে যে তফাত তা তাদের চোখে অনেকটা।

ট্রেনের গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছিল, এই সময় একটা আলো-ঝলমল প্ল্যাটফর্মে। অনুরাধা আর কোনো কথা না বলে ফিরে গেল বাঙ্কের দিকে। আমি দরজার কাছেই একটুক্ষণ।

স্টেশনটা প্রায় জনহীন। সব কটা আলো জ্বলছে, এর মধ্যে সব কিছুই ঘুমন্ত। আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। দূরের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে কেউ উঠছে বা নামছে। অনেক মালপত্র। যে দিকে তাকাও, মনে হবে জীবন কত স্বাভাবিক। মধ্যরাত্রির ট্রেন কোনো অখ্যাত স্টেশনে থামলে এরকমই দৃশ্য, প্ল্যাটফর্মে মানুষ ঘুমোয়, একটা কুকুর অনর্থক ছুটে যায়, ফু-র-র-র করে বেজে উঠল গার্ডের হুইসল—সবই ঠিকঠাক। আর এই সময় কলকাতার শ্মশানে একজন কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে অসময়ে, যে চেয়েছিল কিছু বদলাতে, আর অনেক দূরে, ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ কান্না—কান্না তাকে বিশুদ্ধ করবে, না জীবনটাই বদলে দেবে এমন এক দিকে।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আমি দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ। সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে নিই। কেউ জাগেনি। সাওতাল বধূটির মাথা হেলে পড়েছে তার স্বামীর কাঁধে। স্বামীটির মুখ ঘুমের মধ্যেও বেশ দায়িত্ববান।

মেয়েটি শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ। আমি তার বাঙ্কের কাছে দাঁড়ালাম।

খুব কাছে। যেন আমি একবার তার কপালে হাত। যদি সে মুখ ফেরাত, আমি তাকে আরো দু'একটি কথা। এরকমভাবে দাঁড়ানো মোটেই। অন্য কেউ দেখলে। কিন্তু অনুরাধা আমার উপস্থিতি টের পেলেও মুখ ফেরাচ্ছে না। আমি অগত্যা নিজের বাঙ্কে বেশ সশব্দেই। তবু ওর মুখ অন্যদিকে। ওর সঙ্গে আমার খুব চেনা হয়ে গেল আজ থেকে।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকালের আলো এসেছে জানলা দিয়ে। খুব গাঢ় আলো নয়, শহরে নিজের বাড়িতে শুয়ে থেকে এরকম সকাল আমি চোখে দেখি না।

অনুরাধা ও তার সঙ্গী দু'জন বিছানা গুটিয়ে পরিষ্কার। পরবর্তী স্টেশনের জন্য প্রস্তুত। আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, আমিও ওদের সঙ্গে। মেয়েটির সম্পূর্ণ গোপনীয়তা হরণ করাব জন্য আমার ভেতরে একটা দুর্দমনীয় চোরের মতন। কেনই বা নামব না। আমি তো যেখানে খুশি।

কিন্তু মেয়েটি যদি ভাবে আমি ওকে অনুসরণ করে। ভাবে ভাবুক। অন্যেব সামান্য একটু ভাবনার জন্য আমি কি নিজের। এক কামরার লোক অনেক সময় কি একই স্টেশনে নামে না? তবে, মুশকিল হচ্ছে এই, আমি কাল অরবিন্দ ভৌমিককে বলেছিলাম ডেহরি-অন-শোনেই—। ওরাও শুনেছে নিশ্চয়ই।

অনুরাধা এখন নিচেব বাঙ্কে বধূটির পাশে বসে আছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা নেই। দিনের আলোতে বুঝতে পারি, সঙ্গের যুবক ও বধূটির মুখও খুব বিমর্ষ।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসে, তবু আমি মনস্থির কবতে না পেরে। অরবিন্দ ভৌমিকও জেগে উঠে মিটিমিটি তাকাল আমার দিকে। আমি এই স্টেশনে নামতে গেলেই নির্ঘাত চেঁচিয়ে নানা বকম প্রশ্ন। কেন যে কিছু না ভেবেচিন্তে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

গাড়ি একেবারে থামবার আগেই ওরা দরজার কাছে গিয়ে। থামল, দরজা খুলল, আরো কয়েকজনের সঙ্গে ওবাও প্ল্যাটফর্মে। ওদের আর আমি দেখতে পেলাম না। এই স্টেশনে বেশ চ্যাচামেচি। আমি ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে।

অরবিন্দ ভৌমিক অবধাবিতভাবে প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন?

—চা খেতে।

নিচে নেমে এসে ওদের আর কোথাও কোনোদিকেই। ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। এখনো আমি ইচ্ছে করলে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে এসে। ভিতরের দোলাচল কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। যাক, স্টেশনের নামটা জানা রইল, দু'একদিনের মধ্যেই আমি আবার।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে একটু শান্তি এল। বেশ ভালো চা। টাকা ভাঙিয়ে পরপর দু'ভাঁড়। তারপর কি মনে হলো, আরো এক ভাঁড় হাতে নিয়ে উঠে এলাম কামরায়, সেটা অরবিন্দ ভৌমিকের মুখের সামনে।

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, একি, আপনি আবার কষ্ট করে আমার জন্য।

—আপনার মায়ের জন্য আনব কি?

—না, না, উনি বাইরে কিছু খান না।

আমি আবার নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনে জল ভরছে। দেরি হবে। একটু পায়চারি করার জন্য পা বাড়াতেই। আমাদের কামরাতেই অন্য একটি জানলার পাশে সেই মুসলমান রমণী। কালো সিল্কের বোরখাটা এখন মুখ থেকে নামানো। আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা। কী অসম্ভব রূপ। ভোরবেলায় ফোটা শিশির-ধোওয়ায় কোনো সাদা ফুলের সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। কারণ, ফুলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি সুন্দর হতে পারে, তা আমি কয়েকবার। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, অন্তত এক যুগ এর কোনো অসুখ হয়নি।

নারীটিকে কয়েক পলক দেখে আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে। আমার একটু একটু মনখারাপ। তখন বুঝতে পারি, কোনো কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে কষ্ট হয়, কবিরা কেন একথা। এ এক অনির্বচনীয় কষ্ট, শিলিগুড়ি শহর থেকে জীবনে প্রথম তুষারমৌলি দেখে আমার অনেকটা এ রকম। পর্বতশৃঙ্গ কিংবা সমুদ্রের চেয়েও যে নারীর রূপ তুলনার অধিক পাওয়া যায়, কাপুরুষরা একথা স্বীকার করতে পারে না। আমার ইচ্ছে হয় প্রণাম জানাতে। আমি এই সুন্দরের অংশভাক।

পরক্ষণেই মনে মনে একটু অনুতাপ বোধ। আমার মন এত বিক্ষিপ্ত! একটু আগেই আমি একটি কিশোরীর দুঃখের জন্য, আর এখন আমি আবার নির্লজ্জভাবে অপর নারীর রূপ। অনুতাপ থেকে ক্রোধ জন্মায়। অনুরাধার কান্নার জন্য সমস্ত পৃথিবী দায়ী। এর শোধ তুলতে হবে। অনুরাধা, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার আমার।

এই স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন। এখনো ইচ্ছে করলে ব্যাগ নামিয়ে এনে। ছোট্ট শহরে হয়তো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু ওর দুঃখের শোধ তোলার জন্য কি করতে পারি। শুধু লুকোবার জন্য আমি দশদিককে অন্ধ হতে বলি।

পুনরায় আমি গতি মেলাই ট্রেনের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে। ডেহরি-অন-শোন-এ এসে আমি বিনা আড়ম্বরে বিদায় নিই অরবিন্দ ভৌমিকের কাছ থেকে। তার সব রকম সাহায্যের আহ্বান আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। আমার প্রথম কাজ নদীর ঘাটে। স্বপ্নটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে।

সিঁড়ি একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তন্ন তন্ন করে

খুঁজেও আমি কোনো রক্তের দাগ খুঁজে তো। অথচ, তন্দ্রার মধ্যে কেন দেখেছিলাম দু'তিনটি সিঁড়িতে লেগে আছে পুরোনো রক্তের ছোপ। কী এর মানে ? দু'তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও। হয়তো অন্য কোনো রক্ত, আমার স্বপ্নের মধ্যে—স্বপ্ন অনেক রকম কোলাজ সৃষ্টি করে।

বিশাল সেতু, সেই তুলনায় নদীটি এখন একটু ছোট। আমি একেবারে ধারে নেমে গিয়ে নদীর জলেই চোখ মুখ। এমনভাবে কোনোদিন প্রক্ষালন করিনি। বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নানটাও সেরে নিলে। জামা-প্যান্ট খুলে ফেললাম, কেউ তো দেখবার নেই, ব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বার করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একেবারে বেশি জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। আরে বেশ স্রোতের টান আছে তো! দু'একবার হাত ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই জড়তা কাটে। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, প্রমাণিত হলো এবার। ব্যাপাবটা পুরো ঠিক নয় যদিও। চাইবাসায় একটা সাইকেল পেয়ে, বছর দশেক অনভ্যাসের পরও অতি উৎসাহে চড়তে গিয়ে আমি প্রথমবার এক আছাড়।

কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি আমাব ব্যাগ ও জামা কাপড়ের কাছে একটি ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে। ছেলেটিকে তো একটু আগেও দেখিনি, যেন অন্তরীক্ষ থেকে হঠাৎ টুপ করে। বেশ চতুর চোখ-মুখ। ছোঁড়াটা যদি আমাব ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিঠটান দেয়, আমি কি সাঁতরে পারে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরতে ? আমি জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় ভেজা গায়ে একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ছুটছি এই দৃশ্য!

ছেলেটির দিকে চোখ রেখে আমি চিত ও ডুবে নানা রকম সাঁতারের কসরত দেখাই। তারপর পারের দিকে। সিঁড়িতে এসে বসার পর বেশ অবসন্ন লাগে। সাঁতার দুরন্ত ব্যায়াম। অনেকদিনের অনভ্যাস। যদিও আবার ইচ্ছে হয় জলে নামতে।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আমি জিজ্ঞেস করি, এই, তোর নাম কি ?

সে আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। বাচ্চা ছেলেদের একটা ব্যাপার আছে, তারা কখন কোন কথায় উত্তর দেবে না দেবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদেব ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভব।

পরে মনে হলো, এটা বাংলায় প্রশ্ন করার জায়গা নয়। সুতরাং।

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা ?

—ছোটেলাল।

—ঘর কাঁহা হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

—কেয়া, ঘর নেহি হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

অবাক হতে গিয়েও সামলে নিই। দেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই যে ঘর থাকে না, এ নতুন কথা ? ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। ঠিকই ধরেছিলাম, ছেলেটা আমার ব্যাগটা চুরি করে পালাতেও।

—কাঁহা রহতা হ্যায় ?

ছেলেটি রেলস্টেশনের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, উধার। বুঝলাম রেলস্টেশনের পরগাছা। প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশনেই কিছু কুকুর ও কিছু বেওয়ারিশ বাচ্চা থাকে।

জামা-প্যান্ট পরে নিতে নিতেই বেশ খিদে চনচন ক'রে। স্নান করলেই তৎক্ষণাৎ আমার এরকম খিদে। দিনের যে-কোনো সময়েই হোক।

ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, চিরুনি আনতে ভুলে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ছোটেলালজী, হিয়া খানা মিলতা হ্যায় ?

—হাঁ, মিলতা।

—কাহা ?

—বহুৎসা হোটাল হ্যায়।

আমার এই প্রশ্নগুলি অবান্তর। যে ছেলেটা নিজে রোজ খেতে পায় কিনা সন্দেহ, সেও হোটেলের খোঁজ রাখে। এবং আমি তাকে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে জিজ্ঞেস করি, হিয়া পর কিঁউ আয়া ?

সে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার মনে করে না। আমি তবু হিন্দী বলার উৎসাহে আবার বলি, তুমহারা পিতা মাতা কোই হ্যায় ?

আমার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার ইজেরটা খুলে ফেলে। কোমরে একটা ঘুনসি বাঁধা। তরতর করে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং জলের পোকার মতন সাঁতার কাটে। সে যে আমার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতার জানে, এটা দেখানোই যেন তার। এক একবার ভুস করে মাথা তুলছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথম নজরে দেখেই বুঝেছিলাম, অতি পাজী ছেলে।

ওকে জব্দ করার একমাত্র উপায়, ওর দিকে নজর না-দেওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপারের দিকে। ছেলেটা চেঁচিয়ে কি যেন বলে। আমি শুনতে চাই না। ও যদি গালাগালও করে আমাকে, বিনা কারণেই, আমার সাধ্য নেই ওকে শাস্তি দেবার। হঠাৎ আমার সামনেই কি রকম অবলীলাক্রমে ইজেরটা!

হোটেল খুঁজে দু'খানা চাপাটি আর এক প্লেট পাঠার মাংস নিয়ে। মাংসটা

এমনই ঝাল আর মুখরোচক যে আর এক প্লেট না নিয়ে পারি না। সঙ্গে লেবুর আচার। জীবনে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কি? ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে করতে বেরিয়ে আসি বাইরে। সেখান থেকেই দেখা যায় ছেলেটা এখনো জলে দাপাদাপি। ওকে বকবার কেউ নেই। এত কম বয়েসের এমন স্বাধীন ছেলে আগে দেখিনি কখনো।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কয়েকটা নৈরাশ্যজনক খবর। শোন নদীর ধারে অপূর্ব সুন্দর ডাকবাংলোটিতে থাকবার জায়গা নেই। হোটেলগুলির চেহারা সুবিধের নয়, তাছাড়া হোটেলে থেকে বিলাসিতা করার মতন পয়সা।

ফিরে এসে রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে। যে-কোনো দিকের ট্রেন এলেই। কুলির কাছ থেকে জানা গেল, ডাল্টনগঞ্জের দিকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে। ডাল্টনগঞ্জই বা খারাপ কী? ওখানে পরিতোষ থাকে না? ঠিকানা জানি না অবশ্য, তবে স্থানীয় বাঙালিদের কাছে।

ডাল্টনগঞ্জের মতো যোগারূঢ় নামের জায়গাগুলি চাক্ষুষ দেখার আগে কিছু বিস্ময় রেখে দেয়। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইওরোপের একটা টুকরো। সার সার ঢালু ছাদওয়ালা বাংলো।

পৌঁছে দেখলাম, সেসব কিছুই না। ধুলোয় ভরা রাস্তা, কুদৃশ্য বাড়ি, বিহারের সমতলভূমির যে-কোনো এলেবেলে শহরের মতন। এইসব শহরের চেয়ে শহরতলি অনেক সুন্দর হয়, যেখানে ভূমি স্পর্শ করে দিগন্ত, একটা অচেনা নামের ছোট নদী, মকাই ক্ষেতের পাশে মোষের পিঠে বালক, তন্বী রমণীর মাথায় সোনার মতন উজ্জ্বল পেতলের কলসি।

শহরের মধ্যে টায়ার সারাবার দোকান আর কচৌরি মিঠাই, ডাক্তারখানার শো-কেসে মদের বোতল। একটি ছোট রেডিওর দোকানের মালিককে বাঙালি বলে চিনতে পারা যায়। তিনিও চেনেন পরিতোষকে। পরিতোষের স্ত্রী পুজোর সময় ষোড়শী নাটকে নাম-ভূমিকায়। রেডিও দোকানের মালিকই একটা সাইকেল রিকশাকে ডেকে।

স্থানীয় জেলখানা পেরিয়ে এসে সাইকেল রিকশা একটা বাড়ির সামনে। সদর দরজায় মস্তবড় তালা। পাশের বাড়ির অপর সরকারি অফিসার, মাদ্রাজী, জানালেন, পরিতোষ দু'দিন আগে সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রীকেও সঙ্গে।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, একটা কোনো থাকার জায়গা না পেলে।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সরু চোখে আমার আপাদমস্তক। উনি লুঙ্গির ওপর হাওয়াই শার্ট পরে আছেন, মাথার চুল অবিকল শিশুদের মতন পাশ থেকে সিঁথি কাটা। অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার সহ্য হয় না। আমি মাটি থেকে আমার ঝোলাটা।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু ন-ড-এ মেশানো ইংরেজি শোনার জন্য।

—আর ইউ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়'জ ইয়াংগার ব্রাদার?

অপ্রত্যাশিত রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যানার্জী না বলে বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আগেও লক্ষ করেছি, উচ্চশিক্ষিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয়রাই সবচেয়ে কম সাহেবীয়ানা অভ্যেস করে।

না, আমি পরিতোষের ছোট ভাই নই। গত রাত্রে আমি ট্রেনে অশেষ মজুমদার। আজ আবার অন্য পরিচয়, ক্ষণতরে লোভ হয়, তবু কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ।

—না, কেন বলুন তো?

—মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাইয়ের বেড়াতে আসার কথা ছিল। তাই আমাদের কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন।

—আমি পরিতোষের বন্ধু। এবং আমার আসার কোনো কথা ছিল না।

—বন্ধু? মানে উনি কি জানেন, আপনি হঠাৎ এসে পড়তে পারেন?

অধিকাংশ মানুষেরই কোনো পরিচয়পত্র থাকে না। উনি যদি জেরা করেন, আমি পরিতোষের কতদিনের বন্ধু, কতখানি ঘনিষ্ঠতা, কী ভাবে তার প্রমাণ? হঠাৎ এসেছি খবর না দিয়ে, পরিতোষ গেছে সফরে, সরকারি অফিসাররা তো এরকম প্রায়ই। উনি আমাকে ঘরের চাবিটা দেবেন কিনা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আজকাল কতরকম তঞ্চক-বঞ্চক।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মতন একটা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পরিতোষ কখনো কফিতে চিনি খায় না।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। ঠিক বুঝতে। উনি হয়তো আমাকে জেরা করতে (চেয়েছিলেন কিংবা চাননি)।

তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর থেকে চাবি এনে। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে তালা। আলোর সুইচ। তারপর আমার দিকে ফিরেই বললেন, আপনার বন্ধু দু'দিন বাদেই ফিরবেন।

আমার রাত্রে থাকার একটা জায়গার দরকার ছিল। আমি ওঁকে তিনবার ধন্যবাদ।

উনি চলে যেতেই আমি দরজা ভেজিয়ে সোজা ঝপাং করে পরিতোষের বিছানায়। নিভাঁজ চাদরপাতা এরকম বিছানা দেখলেই আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, ইট মাস্ট বী ওয়ান্ডারফুল টু বী অ্যালাইভ! কেন একথাটা আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি নিজেও জানি না! অনেক সময় একা একাও ইংরেজিতে। অকস্মাৎ পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে একটা বন্য নদীর মতন খাসা দৃশ্য দেখেও আমরা বলি, বিউটিফুল! বেশ জোর দিয়ে।

একটু পরেই দরজায় শব্দ ও সামান্য ফাঁক হলো। সেই ভদ্রলোক। একটু আগেই আমি ওঁর নাম শুনেছি এবং ইতিমধ্যেই ভুলে। শেষটা যেন মনে হয়েছিল নেড়ুচেনঝিয়ান! এরকম কোনো নাম হয়? কিংবা ভুল শুনেছি। প্রথম নামটা কি যেন? খুব অন্যায় নাম ভুলে যাওয়া।

ভদ্রলোক আমাকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করলেন ওঁদের বাড়িতে। আমি ভয়ে শিউরে। ভয়টা আসলে অভদ্রতার। ভদ্রলোক সত্যি অতি ভদ্র, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা যায়। কি করে এঁকে প্রত্যাখ্যান।

দক্ষিণ ভারতীয়দের আর সব কিছুই আমি ভালোবাসি। সঙ্গীত পর্যন্ত, কিন্তু ওদের রান্না খাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর। আগাগোড়া নিরামিষ খাদ্য আমার দু'চক্ষের বিষ। পৃথিবীর সমস্ত নিরামিষ জিনিসের মধ্যে আমি একমাত্র পছন্দ করি বিধবা নারীদের।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন? তাতে কি? আর একবার খাবেন, আমাদের সঙ্গে ভেরি লাইট ফুড। আমার ওয়াইফ বললেন—

—না, সত্যিই আজ আর কিছু খেতে পারব না। একদম পেট ভরা।

—তা হলে আসুন, এক কাপ কফি খাবেন অন্তত।

এরপর আর না বলা যায় না। ওঁরা ভাবছেন, আমি একলা একলা ঘরের মধ্যে, সেই জন্যই কিছু অন্তত ভদ্রতা না করলে। সহকর্মীর বন্ধু, খানিকটা সৌজন্য তার প্রাপ্য।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি স্নান করতে চাই, গরম জল লাগবে কি না। তা হলে ওঁর বাড়ি থেকে।

—না, না, না।

—খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করা যায়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওয়াস করে তার পর আসুন। ডোনট হেজিটেট টু আসক ফর এনিথিং—

অনেকের অভ্যেস আছে সন্ধের পর স্নানের।

বিশেষ করে ট্রেন জার্নির পর। আমি অনেকটা গাঁজাখোরের মতন বেশি স্নান-টান এড়িয়ে। দিনে একবারই যথেষ্ট। বিশেষত আজ সকালেই শোন নদীতে সাঁতার কেটে।

এক হাঁড়ি গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে আমি কোনোক্রমে মুখে হাতে ঘাড়ে। বাকি জলটা গড়িয়ে ফেলে দিলাম। তারপরও পাঁচ সাত মিনিট বাথরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে, স্নান করতে যতটা সময়।

এইসবগুলো সত্যিই মজার ব্যাপার। কেউ কি সত্যি দেখছে আমি বাথরুমের

মধ্যে স্নান করছি কি না? তবু আমি স্নানের অভিনয়। অকারণেই পরিতোষের আফটার শেভ লোশান থেকে খানিকটা গালে। বাথরুমে পরিতোষের স্ত্রী শ্রীলেখার ব্যবহার্য কোনো জিনিসই নেই। মেয়েলি গন্ধও না। সিনেমা হল-এ গিয়ে কতবার আমার মেয়েদের বাথরুমটার ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে।

উনি বাইরের দরজার কাছেই। জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং ফ্রেশ? আমি অমায়িক হাসো উত্তর।

পাশাপাশি দুটি ছোট একতলা হুবহু এক রকম। কিন্তু পরিতোষের তুলনায় মিঃ নেড়ুচেনঝিয়ানের (?) বাড়ি কত ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝে তেল-চকচকে। মঙ্গোলিয়ান ও আর্যদের তুলনায় দ্রাবিড়দের পরিচ্ছন্নতা বোধ অনেক বেশি। এ ছাড়াও অবাক হবার মতন একটা জিনিস।

কফি প্রস্তুত। বসবার ঘরে নিচু খাটের ওপর নকশা-কাটা মাদুর। তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট লাল মখমলের তাকিয়া। পাশে একটা টেবিল। কিন্তু সবচেয়ে যা দেখে আমি প্রথমে খুব অবাক, তা হলো দোলনায় বসা একটি নারী। ঘরের ঠিক মাঝখানেই ঝুলছে দুটি দোলনা। বসবার ঘরে এরকম দোলনা আমরা আশা করি না। বাচ্চাদের জন্য নয়, রীতিমতন বড়োদের। পরে মনে পড়ল, মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বাড়িতে এমন দেখেছি। চেয়ার টেবিলের চেয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ নয়।

দোলনায় বসেছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ঘাগরা ধরনের লাল শাড়ি, গাঢ় নীল ফুলকাটা পাড়। কাঞ্জিভরম শাড়ির নাম বিজ্ঞাপনে দেখেছি, এইটাই? মহিলার গায়ের রং তেঁতুল বিচির মতন বেগুনি-কালো, সেই রকমই মসৃণ। অত্যন্ত সুশ্রী মুখখানি আরো লাবণ্যময়ী হয়েছে একটি নাকছাবিতে। কতদিন পর একজন নাকছাবি পরা নারীর সঙ্গে কথা বলব সামনাসামনি।

আমি বললাম, নমস্কার।

দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বসুন।

পরিষ্কার বাংলা : মেয়েরা অনেক চটপট ভাষা শিখতে। ভদ্রলোক বাংলা একেবারেই। ইস, এর নাম নেড়ুচেনঝিয়ান কিংবা ঐ টাইপের কিছু না হয়ে নাউড় বা রামস্বামী জাতীয় সহজ কিছু হতে পারত না? কিংবা কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামে, তা হলে মনে রাখা।

মহিলাটির নাম, স্বামী বললেন পদমা, উনি নিজে বললেন, পদ্মা। কোথায় পদ্মা নদী, এখন বিদেশে, আর কোথায় দক্ষিণ ভারতে সেই নাম। অবশ্য বাংলাদেশেও তো কাবেরী নামে। নদীর নামে নামের মেয়েরা স্বভাবতই একটু উচ্ছল। এই নারীটির সারা শরীরে বাজনা।

পদ্মার স্বামী আর আমি দোলনায় বসলাম। টেবিলের ওপর কফি পট আর

বীয়ার মগের মতন বড়ো বড়ো কফির কাপ। কিছু চানাচুর ও সেমুই ভাজা। যা ভেবেছিলাম তাই, সারা বাড়িতে নিরামিষ গন্ধ। নিরামিষ খেয়েও এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কি করে? নিরামিষ খেয়েও নারীরা রূপসী হয়। আর্যরা ছিল প্রায় সর্বভুক এবং অতি মাংসাশী, অথচ ভারতের বেশির ভাগ মানুষই নিরামিষাশী। আসলে সাহেব ও আরবরাই খাঁটি আর্য।

আমরা যেমন বেশির ভাগ সময় চা, এরা তেমনি কফি। কারণ খুব সাধারণ। যে-কারণে উত্তর ভারতে বেশি অ্যামবাসেডর গাড়ি, দক্ষিণ ভারতে ফিয়াট। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা বেশি মাছ খেলেও এরা।

দোলনায় দুলতে দুলতে কফি। এবার কলকাতায় ফিরেই বসবার ঘরে একটা দোলনা। বেশ জোরে জোরে দুলতে লাগলাম, কফি উছলে পড়ছে না। খাটের ওপর বসে আছেন পদ্মা, হাতে চানাচুরের প্লেট। আমি দুলে সেখানে গিয়ে খপ করে এক মুঠো চানাচুর তুলেই আবার। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। ইস, এখানে না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কোনো কাজে এসেছেন?

—না, এমনিই। বেড়াতে।

—বেড়াতে? এখানে বেড়াতে?

পদ্মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে আবার হাসির কী আছে রে বাবা!

স্বামীটি বললেন, এখানে কেউ বেড়াতে আসে? কি আছে দেখবার? তবু যদি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যেতেন; কিংবা যদি বিজার্ভ ফরেস্ট যেতে চান—

—কেন, জায়গাটা খারাপ?

পদ্মাই আবার বললেন, খুব বাজে, খুব বাজে। আমার বিচ্ছিরি লাগে।

অবাঙালি নারীর মুখে বাংলা বেশ মিষ্টি। বিচ্ছিরি শব্দটাও সুন্দর।

আমি হেসে বললাম, কেন, এখানে তো কোয়েল নদী আছে।

পদ্মা তাঁর ঠোঁট ওল্টালেন অবজ্ঞায়। এই ভঙ্গিটি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু আমি বেশি বেশি না দেখে। জানি না, ব্যবহারে কোথায় কি ভুল হয়ে। নিজেদের জন্মস্থান থেকে এত দূরে, মাতৃভাষায় কথা বলার একটিও লোক নেই, বিহারে এই ক্ষুদ্র শহরে নেই কোনো উত্তেজনা, ওদের ভালো না লাগবারই তো। পছন্দমতন খাদ্যও কি। এখানে কি ক্যাপসিকাম পাওয়া যায়? শুধু কোয়েল নদী দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

স্বামীটি, এর নাম আমি রাখলাম স্বামীনাথন, বললেন—সন্ধের পর এখানে কিছুই করার নেই। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলে তবু একটু আড্ডা হয়। কিন্তু ওঁরা

প্রায়ই বাইরে বাইরে।

পদ্মা বললেন, অন্য সময়ে আমরা কি করি জানেন, দু'জনে মিলে তাস খেলি।

সত্যিই এটাকে আনন্দের জীবন বলা যায় না। শুধু চাকরির জন্য দুটি স্বাস্থ্যবান নারী পুরুষ দিন দিন শাকচচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কোনো সন্তান। বাড়িতে নেই কোনো শিশুর শব্দ কিংবা ভাঙা খেলনা।

স্বামীনাথন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী সার্ভিসে আছেন?

—সার্ভিস?

—গভর্নমেন্ট না পাবলিক এন্টারপ্রাইজে? কিংবা বোধহয় নিজের বিজনেস।

এক মুখ হেসে বললাম, বেকার।

স্বামীনাথন বললেন বাঃ! এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে!

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মা আমার বেকার থাকার কথাটা তেমন পছন্দ করলেন না। বোধহয় ভাবলেন, বাঙালিরা বড্ড বেশি বেকার থাকে। বাঙালিদের উদ্যম নেই। শুধু রাজনীতি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, এখনো সার্ভিস নেননি কেন?

পাছে আমি বিব্রত বোধ করি, তাই স্বামীনাথন তাড়াতাড়ি বললেন, হী মাস্ট বী ইয়াংগার দ্যান মী, এখনো অনেক সময় আছে, যতদিন ফ্রি থাকা যায়।

এবার আমি পদ্মার দিকে তাকিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, আমি একজন রাইটার।

—রাইটার? আপনি কি লিখেন?

—পোয়েট্রি।

স্বামী স্ত্রী একবার চোখাচোখি। আশাই করেননি। এরকম নির্লজ্জভাবে। যেন কেউ বলছে আমি বেকার, কিন্তু মাঝে মাঝে চুরি করি।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গান করেন?

তেমনি সহাস্য মুখে আমি, না।

—তবে কবিতা লিখে কি করেন?

—কাগজে ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে।

—একটা শোনান না।

—বাংলা।

—তা হোক। তবু শোনান।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম, 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—' ইত্যাদি লাইন আষ্টেক এখনো মুখস্থ আছে, শুনিয়ে দিলাম। একই কথা।

স্বামীনাথন বললেন, এবারে মনে পড়ছে, আপনার কথা আমি মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তার এক বন্ধু পোয়েট্রি লেখে, খুব বোহেমিয়ান।

বুঝলাম, আমি নয়, পরিতোষ নিশ্চয়ই শক্তির কথা। প্রতিবাদ না করে, মৃদু মৃদু হাসি মুখে চুপ করে তাকিয়ে। দোলনায় জোরে জোরে দোলা।

এরপর কিছুক্ষণ পরিতোষ আর শ্রীলেখার কথা। আমিও সোৎসাহে। আমি যে ওদের বন্ধু তার নির্ভুল প্রমাণ।

দু'কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ওঠা উচিত। দোলনা থেকে নামতেই পদ্মা বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন?

আমি অন্তত সাত আট রকম তাসের খেলা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে নতুন কিছু খেলা আছে কিনা জানি না।

—কী খেলা?

—ফিস, রামি?

—জানি।

—খেলবেন?

—এখন? অনেক রাত হয়ে গেছে না! এমনই আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।

স্বামীনাথন বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট ফিল শ্লিপি—আমরা অনেক রাত পর্যন্ত।

—আমার আপত্তি নেই।

অবিলম্বে নিচু খাটের ওপর তাস খেলায়। ওরা ওদের রাত্তিরের খাবার দুটি প্লেটে সাজিয়ে পাশে নিয়েই। নিরামিষে এটো হয় না।

রামির তাস বিলি হতেই আমি বললাম, রামি খেলা তো স্টেক ছাড়া জমে না।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বললন, এগজ্যাকটলি। রোজ আমরা দু'জনে স্টেকেই খেলি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে, এত বাজে লাগে...। আজ আমরা একজন পোয়েটকে পেয়েছি, তাকে হারাব।

—লেট আস সি।

একটুক্ষণের মধ্যেই তাস খেলা বেশ। ওরা দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়। মেয়েটিরই নেশা বেশি। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকবার পুরো হাত হারলাম। মুশকিল হচ্ছে আমার পুঁজি কম, বেশি টাকা নিয়ে না বসলে বাজির খেলায় পৌরুষ দেখানো যায় না।

খেলতে খেলতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গত রাত্রে ছিলাম ট্রেনে, অচেনা লোকদের সঙ্গে। আজ আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে তাস। আমার

ডাল্টনগঞ্জে পরিতোষের কাছে আসার কোনো কথাই। কলকাতা ছেড়ে বেরুবার সময় ক্ষীণ ইচ্ছে ছিল চাইবাসায় সমীরের কাছে। কিন্তু এখানে না এলে এই দম্পতির সঙ্গে।

আমার ঠিক উল্টো দিকেই বসেছে পদ্মা, ডান পাশে স্বামীনাথন। পদ্মার চোখের পল্লবগুলি অনেক দীর্ঘ, হাতের আঙুলগুলি এত কোমল মনে হয়। পা দুটো মুড়ে বসেছে বলে তার একটি সম্পূর্ণ উরু। কোনো স্বাস্থ্যবতীর মাংসল উরুর সঙ্গে কি পারস্যের ছুরির উপমা দেওয়া যায়? পাখির নীড়ের সঙ্গে যদি চোখের।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অনুরাধার মুখ। একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে মিলিয়ে। বাড়ির লোক ওকে জোর করে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। ওর নীরবতা ও দুঃখ আমার মধ্যে এমন একটা ছাপ ফেলেছে। যেন আমাকে যেতেই হবে ঐ ছোট্ট শহরটিতে, আবার দেখতে হবে ঐ কিশোরীকে যতক্ষণ না ওর গোপনীয়তা। অনুরাধা, আমি যাব তোমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, তবুও।

একটু পরেই স্বামীনাথন হারতে লাগলেন। ভুলভাল তাস ফেলে ফেলে। তাঁর স্ত্রীর মৃদু বকুনি। আমি পরপর দু'বার পদ্মাকে পুরো হাত সমেত হারিয়ে দিতেই সে বেশ উত্তেজিত। সে হারতে ভালোবাসে না। তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই আমি প্রাণপণ মনোযোগে। তবু আমিই হারলাম। পরের বারও। পরাজয় উসুল করার জন্য আমি তার বুক ও নগ্ন কোমরে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে সে আবার দ্রুত তাস বিলি। স্বামীকে বলে, নাও, নাও, তুমি এত স্লো।

এক মিনিট পরেই স্বামীনাথনের হাত থেকে তাসগুলি ঝরঝর করে। বসে থাকা অবস্থাতেই তার নাক ডাকে। তারপর মাথা হেলে পড়ে পাশে।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে। পদ্মার চোখ। হাত। কাঁধের ডৌল। খসে পড়া আঁচল। পারস্যের ছুরি।

পদ্মা বলল, একি, আর খেলা হবে না?

আমি হাতের তাসগুলো উল্টে দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তির ভঙ্গি। পরক্ষণেই ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে সরু করে স্বামীনাথনের নাকের মধ্যে। আমার চোখে চোখ, যেন আমরা একই ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

নাকে খোঁচা খেয়ে স্বামীনাথন ধড়মড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায়

কি যেন, মনে হয় যেন বিরক্তিসূচকই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গিতে হিন্দীতে বললেন, সরি, ভেরি সরি, নিদ আ গয়া।

ঘুমের ঘোরে উনি ভুলে গেছেন আমি হিন্দীভাষী নই। বিহারে থাকার জন্য আচমকা ঐ ভাষাতেই।

আমি বললাম, আপনার ঘুম এসে গেছে, এখন খেলা বন্ধ থাক।

পদ্মা আদুরে অনুনাসিক গলায় বলল, না, রাত তো বেশি হয়নি, এর মধ্যেই ঘুম ?

স্বামীনাথন চোখ কচলে বললেন, ঠিক আছে, আর একটু যদি খেলতে চাও।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মানুষকে একটু দুর্বল। মানুষের মুখে বুদ্ধির ছাপটার নামই তো ব্যক্তিত্ব, ঘুমের সময় বুদ্ধি ছুটি নেয়।

স্বামীনাথন এক ফাঁকে উঠে বাথরুমে। পদ্মা আবার তাস বিলি করছে, আমি দেখছি ওর আঙুল, রক্তাভ নখে স্বাস্থ্যের আভা। নারীটি বেশ ছটফটে, এই মফঃস্বলের জীবন ওর জন্য নয়। যেমন—।

—আপনি সাউথ ইন্ডিয়ায় কোথাও গেছেন ?

পদ্মার এই প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠি, আমি তখন অন্য কথা। আমি এখানে ছিলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—আপনি বুঝি খুব।

—হ্যাঁ।

—বেশ মজার তো! ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না।

—মেয়েরা আবার এমন অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা—

—কী রকম ?

উত্তর দেওয়া হলো না। স্বামীনাথন ফিরে এলেন। আমার একটা লঘু ইয়ার্কির কথা মনে এসেছিল, যা কোনো স্বামীর সামনে বলা যায় না। বললে কোনো দোষ নেই, কিন্তু আড়ালেই।

তাস তুলে নিলাম। আরো কিছুক্ষণ খেলা। কিন্তু আর ঠিক জমছে না। স্বামীনাথন বড়ো বড়ো হাই। বেচারাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। হারছেও খুব। স্বামীর ঘুম তাড়াবার জন্য একবার পদ্মা রেকর্ড প্লেয়ারে একটা গান চালিয়ে দিল, এম এস শুভলক্ষ্মী। তাতেও সুবিধে হলো না, যখন কারুকে ঘুমে পায়।

মাঝে মাঝে পদ্মা মৃদু ভর্ৎসনা করছে স্বামীকে। তখন আমি নীরবে। চোখ চলে যায় পদ্মার দিকে। ওর কোমর ও পেটের অনেকখানি নগ্ন। কোনো নারীর পোশাক যদি হ্রস্ব হয়, সেদিকে তাকানো কি অসমীচীন ? তাহলে পোশাক হ্রস্ব কেন ? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নারীদের কোমর আমার

কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয়দৃশ্য, আমি স্বীকার করছি, বার বার সেই দিকে চোখ।

স্বামীনাথন আর একবার ঢুলে পড়তেই আমি নিজেই বললাম, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না, আমারও এবার।

স্বামীনাথন লজ্জিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওরা দু'জনেও।

পদ্মা বলল, আপনারও ঘুম পেয়েছে?

—হ্যাঁ, মানে, খেলা আর জমছে না।

—আপনি বললেন না তো, মেয়েরা কি এমন পারে যা ছেলেরা পারে না?

আমি এমনভাবে হাসলাম, যার তেষট্টি রকমের মানে হতে পারে। এমন কি চৌষট্টি রকমও। ওকে একটু ধাঁধায় রাখলে ক্ষতি কি?

বিদায় নেবার জন্য সময় না নিয়ে আমি দ্রুত দরজার কাছে। স্বামীনাথন জানালেন, কাল সকালে আমার কফি। রাত্রে কিছু দরকার হলে যে-কোনো সময়।

দরজার ওপরে একটা হাত তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা বলল, আমার মোটেই এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করে না—

এ ব্যাপারে মীমাংসার ভার ওর স্বামীর ওপরে দিয়েই আমি বাইরে। আসলে আমার পেট চুঁই-চুই করছে খিদেতে। ওঁদের বাড়ির নিরামিষ খাবার প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিলাম, রাতটা না খেয়েই। কিন্তু এখন দাউদাউ আগুন।

রাত দশটা বাজে। এখনো কোনো কোনো পাঞ্জাবীর হোটেল। দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায়। বেশি দূর যেতে হলো না, পেট্রল পাম্পটার পাশেই বৃদ্ধ সর্দারজী তাঁর দোকান খুলে বসে ছিলেন যেন শুধু আমারই প্রতীক্ষায়। ভাত নেই, কিন্তু রুটি, তরকা, আলু-মটর, আলু-পনীর। না, ফিশ কারি, মাটন কারি, ফাউল কারি—সব শেষ। এখানেও নিরামিষ খেতে হবে? আজ রাতে আমার নিরামিষ ভবিতব্য? আন্ডা হ্যায় তো? ঠিক হ্যায়, ভাজো। রুটির সঙ্গে তিন তিনটে ডিমভাজা। খাওয়ার পর শরীরে বেশ একটা।

ফেরার পথে নিস্তব্ধ রাস্তায় শুধু আমার জুতোর শব্দ। শরীরে আরাম দিচ্ছে মদালসা বাতাস। কোথাও একটা রাতপাখির ডাক। হঠাৎ ওপরে চোখ যায়। বিশাল উদ্যান। এর নিচে আমি কী অসম্ভব ছোট ও একা। নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধে আমি যেন আরো চুপসে যাই। কিংবা যেন আমি আর নেই, অদৃশ্য হয়ে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য, নির্জন, তার ওপরে মাতৃস্নেহের মতন জ্যোৎস্না। প্রথম যে চাঁদে পা দিয়েছিল তার নাম নীল আর্মস্ট্রং। আমার নামে নাম। মৃত্যুর আগে আমি বলে যাব, আমিও সুন্দরকে।

খুব মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাড়ির কাছে। স্বামীনাথনদের দিকে

তাকালাম। দরজা বন্ধ, আলো নিভে গেছে। এর মধ্যেই কি? পদ্মা বলেছিল। এখন আবার গিয়ে ডাকা যায়? কেনই বা ডাকব? 'কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে?'

আমার, অর্থাৎ পরিতোষের ঘরের দরজার কাছে একটা কুকুর। আগে তো ছিল না। চেহারাটা বেশ ভয়াবহ। এদিকে ওদিক একটা ইঁটের টুকরোর জন্য। সেটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গলায় ঘাউ ঘাউ করে। বিশ্রীভাবে ভেঙে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। এইসঙ্গে কি স্বামীনাথনরা জেগে উঠবে? কুকুরটাকে রাগাবার জন্য আমি আরো দু'বার পাথর ছুঁড়ে। ওটা আসলে ভীতু, তাই অত গলার জোর, ছুটে পালাল।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট। আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এখনো সামনে দীর্ঘ রাত। পরিতোষ কল্পনাও করতে পারবে না, এই সময় আমি তার বিছানায়। অনেক দিন আগে পরিতোষের কাছে যখন এসেছিলাম, তখন ওর ছোট খাট ছিল, সেবার আমাদের সঙ্গে দীপকও, কত কষ্ট করে যে তিনজন সেই খাটে। এখন এত বড়ো বিছানায় তিন-চারজন অনায়াসেই। বড়ো বিছানা বলেই আমার খুব একা একা লাগতে।

আমি জীবনে কী চাই? জীবন আমার কাছ থেকে কী? জানি না, জানি না, জানি না! কতগুলো বছর কেটে গেল, কিছুই জানি না। জানার কী খুব দরকার? আজ সকাল পর্যন্ত আমি কী চাই, তা জানতাম। আমি চেয়েছিলাম অনুরাধা নাম্নী একটি মেয়ের দুঃখের। কে অনুরাধা? ট্রেনে কিছুক্ষণের জন্য। অসম্ভব গভীর মনে হয়েছিল তার দুঃখ। ঐ মেয়েটির বদলে যদি একটি ছেলের দুঃখ? তা হলেও? সত্যি জানি না, জানি না, জানি না। জানার কি খুব?

পরিতোষের ঘরে বইটই বিশেষ নেই। রাত্রে একটা বইকে অন্তত সঙ্গী করে না শুলে। র‍্যাকের ওপরে দুটো সরু-মোটা টাইম টেবল, কয়েকটা সিনেমার পত্রিকা। নিচের তাকে গীতবিতান, দুটি বাংলা উপন্যাস (পড়া), তিনখানা আমারই বন্ধুদের লেখা কবিতার বই, একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকখানা ইংরেজি পেপার-ব্যাক, একটা ডায়েরি, সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এর মধ্যে কোনো বইটাই ঠিক আকৃষ্ট। অথচ একটা বই চাই-ই। আমি চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে যে-কোনো একটা।

গীতবিতানটিই উঠে এল। গীতবিতান পড়তে পড়তে ঘুমের চর্চা! তবু পাতা উল্টে উল্টে। বইয়ের মাঝখানে গানের চেয়েও আকর্ষণীয় অন্য কিছু। টুকরো টুকরো করে ছেড়া কাগজ। মনে হয় চিঠি। এত ছোট টুকরো করা হয়েছে মনে হয় হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যই। তবু যত্ন করে রাখা কেন বইয়ের ভাঁজে?

চিঠিটা যে ছিড়েছে সে পরে নিশ্চয়ই মত বদলেছে। ছেঁড়া চিঠি বলেই মনে হয় অনেক কিছু গোপন। আমি টুকরোগুলো সাজাবার চেষ্টা করি। আমি ভুল...সেদিন বিকেলে...জানি কেউ...ভয় নেই...তোমার মু...ভারি তো এক ...আমার ছো বনের কিছুই সেও তো দু...বর্ধমানে...তোমার বু...নেক আশা...

না, অসম্ভব, এ টুকরোগুলো মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার। জেলখানার কোনো কয়েদিকে যদি এ কাজ দেওয়া যায় তার বেশ ভালোই সময় কেটে যাওয়ার। আমার আর ধৈর্যে। চিঠিটা কি শ্রীলেখার? সেগুলি গীতবিতানের মধ্যেই রেখে দিয়ে আর একটা বই। ইংরেজি পেপার-ব্যাক, মলাটে পুরোপুরি খোলামেলা মেয়ে, যারা রেল স্টেশনের বুক-স্টল আলো করে থাকে। এটাই আপাতত।

মাঝে মাঝে খটখাট শব্দ। ইঁদুর আছে নাকি! খাটের নিচে উঁকি মেরেও কিছু। হয়তো মূষিকরূপী চপল ইন্দ্রিয়। কী ভীষণ একা লাগছে। হোটেলের ঘরে থাকলে একটা। আমার বইতে চোখ। মন্দ না, মেয়েটির নাম সৃজি, সে কারুকে ভালোবাসতে পারে না—

বাইরে কিসের যেন ছপছপ শব্দ। কেউ যেন জল ছেটাচ্ছে। বৃষ্টি নাকি? না তো, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছেটানোর মতন, আমার ঘরটার ঠিক পাশেই। আমি পায়ে পায়ে বাইরে চলে এলাম, শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে। সেখানে একটা বাগান, ছোটখাট হলেও, অনেক ফুলগাছ।

সেই দিকে এসে অদ্ভুত দশা। জ্যোৎস্না যামিনী, সেই জ্যোৎস্নার বাগানে এক নারী, তার কাখে একটা জলভরা কলসী। আপন মনে ঘুরে ঘুরে জল ছেটাচ্ছে। প্রথমে গাটা ছমছম। অপ্রাকৃত মনে হয়। মানুষ, না অলীক? তবে ভয়েরও নেশা নেশা ভাব! আরো বেশি ভয় পেতে ইচ্ছে। আমি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে, কে?

নারীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। গাছে গাছে জল-ছড়া দিতে দিতে। একবার সে আমার দিকে মুখ। হাসল। কালো রঙের মুখে অত্যন্ত ফর্সা হাসি। পদ্মা।

—এ কি?

—আপনি ঘুমোননি?

—না, শব্দ শুনে উঠে এলাম। কী করছেন?

—বলেছি তো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

—কী করছেন এখানে?

—গাছে জল দিচ্ছি।

—এত রাত্রে কেউ গাছে জল দেয়?

—দেয় না বুঝি?

—কখনো দেখিনি।

—আমি দিই। রোজ রাত্রে। তাই তো ফুলগুলো এমন

—আপনার ভয় করে না?

পদ্মা উত্তর না দিয়ে কুলকুল করে হাসল। আবার জল দিতে দিতে অন্য দিকে। আমি একদৃষ্টে। বাগানে জল দেবার জন্য ঝারি পাওয়া যায়, তার বদলে ওর কাঁখে কলসী। ঠিক কোনো গ্রাম্য মেয়েব মতন। ওর কোমরের গড়নটা কি অপূর্ব। ঠিক পাথর কেটে কোনারকের মূর্তিগুলো যেমন। আমি বড়ো কোমর-লোভী, দু'চোখ ভরে ওর কোমর। ঘাগরার ওপরে ব্লাউজ, উড়নিটা রেখে এসেছে।

জল ছড়াতে ছড়াতে ও আমার কাছেই। আমি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললাম, আমাকে একটু জল দেবে! আমার তেষ্টা লেগেছে।

ও হেসে কি যেন উত্তর। মনে হলো, না।

আমি বললাম, একটু জল দেবে না? তুমি বুঝি শুধু গাছকেই জল দাও, মানুষকে দাও না?

ও এবাব কলসী উপুড় করে দেখিয়ে বলল, নেই।

—আর নেই? আমার যে তেষ্টা পেয়েছে?

—খুব?

—হ্যাঁ।

আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে ও বলল, এই নাও।

ততক্ষণে ও ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলেছে, বন্দী একটা বলের মতন বেরিয়ে এসেছে ওর স্তন।

আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে ও খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, এই নাও।

আমি সেই মুহূর্তে একটি শিশু। প্রথমে জিভ ছোয়ালাম ওর স্তনবৃন্তে। কী গরম। তারপর সম্পূর্ণ মুখটা চেপে। ও আমাব মাথায় হাত। আমার শরীর কাঁপছে। সেই শক্ত অথচ ও কোমল, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্তনে আমাব মুখ ও চোখ। ততক্ষণে শিশু থেকে পুরুষ, আমি দু'হাতে ওর কোমর। যেন ওকে কতদিন থেকে চিনি, অথচ আজই প্রথম শরীরের চেনা।

নিজেকে বিযুক্ত করে একবার ওকে দেখা। বৃষ্টিব মতন জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে ওর মাথায়। ওর সামনে পেছনে, দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ, ও দাঁড়িয়ে আছে ঋজু হয়ে, একটি স্তন শুধু অনাবৃত।

ও হাত বাড়িয়ে বলল, এসো। আমি ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতেই ও মুখটা সরিয়ে। আমার মাথাটাও জোর করে নিচের দিকে। ফের ওর বুকে। যেন আমি ওকে তৃষ্ণার কথা বলেছি বলে ও তৃষ্ণা মেটাতে চায়। কিন্তু পুরুষমানুষের তৃষ্ণা।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওর দুই ঊরু জড়িয়ে ধরে ওর কোমরে এক লক্ষ চুম্বন। কিংবা এক লক্ষের থেকে একটা দুটো কম হতে পারে।

ও বলল, এখানে নয় আর। এসো।

দৌড়ে গেল আমারই ঘরের দিকে। আমিও পিছু পিছু। ঘর পেরিয়ে বাথরুমে। দাঁড়াও আসছি। আমি শুনলাম না। আমিও ভেতরে। বাথরুমের দরজার পাশে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন চুম্বন আমি জীবনে আগে কখনো। আমি উর্বশীর ঠোঁট থেকে অমৃত নিচ্ছি। একবার দুবার তিনবার, আরো দাও, আরো দাও—

খুট খুট খুট খুট শব্দ। হাত থেকে বইটা মাটিতে। আলো জ্বালা, দরজা খোলা। আমি কোথাও যাইনি ? পদ্মা কোথায় ? সে যে এখানেই এই মাত্র। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি ? কিন্তু আমার ঠোঁটে যে এখনো চুম্বনের। শরীরে সেই উষ্ণতা। তা হলে! আবার সেই খুট খুট খুট খুট। কিসের শব্দ ? মুষিকরূপী ইন্দ্রিয় ? কপালে ঘাম জমেছে। স্বপ্ন এত তীব্র হয় ? আমি কি জল ছড়ানোর শব্দ শুনিনি ?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে। ঘুরে পেছন দিকটায়। সত্যিই একটা বাগানের মতন আছে। বেশ কিছু গোলাপ গাছ। আমি তো এদিকটায় আগে আসিনি, বাগান দেখিনি, তাহলে কি করে স্বপ্নে ? বাগানের মধ্যে ঢুকে আমি নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। মাটি ভিজে ভিজে। গোলাপগুলির পাপড়িতে ও পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জল। সত্যিই জল ছড়িয়েছে একটু আগে মনে হয়। তাহলে কোথায় সেই এক বুক খোলা নারী, যে এখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্নান ?

স্বামীনাথনদের বাড়ির দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। একই সঙ্গে আমার লজ্জা ও দুঃখ। ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি লজ্জিত বোধ করতাম। সত্যি নয় বলেই বিষম দুঃখ, বিষম দুঃখ।

ফিরে এলাম ঘরে। এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। দরজা খোলাই ছিল যদিও! বাথরুমের মধ্যে। এখানেও কেউ। তখন আমি সেই বাথরুমের দরজার পাশে দাড়িয়ে এক কাল্পনিক নারীকে তিনবার প্রগাঢ় চুম্বন। ওষ্ঠ থেকে অমিয়। তার ঊরু চেপে ধরে পায়ের কাছে। স্বপ্নের চেয়েও এই জেগে থাকা কাল্পনিক প্রণয়লীলা কম তীব্র হয় না। এর পরেও বিরাট অতৃপ্তি নিয়ে আমি ফিরে আসি বিছানায়। তারপর পাজামার দড়ি খুলে।

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম। বিছানায় উঠে বসেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয় আমাকে। আজ সারাদিন কীভাবে ? পরিতোষ দু'তিন দিনের মধ্যে ফিরবে না। শ্রীলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন। এই দু'তিন দিন আমি ? এখানে

থেকে যাওয়া যায় অবশ্য, কোনো অসুবিধে নেই, পরিতোষের ভাঁড়ারে চাল ডাল আছে, আমি নিজেই খিচুড়ি ফুটিয়ে। কিংবা কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল। কিন্তু কী করব একা একা? অথচ একা থাকতেই তো আসা, নইলে কলকাতা ছেড়ে। যেখানে হাজার পরিচিত মানুষ।

কালকের স্বপ্নটাই যত গণ্ডগোল। এরপর পদ্মার কাছে মুখ দেখাতে। সামান্য পরিচয়, তাতেই এমন অবৈধ। দুপুরে স্বামীনাথন অফিসে যাবে। তখন কি পদ্মা ঘুমোয়? সেই সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হতে পারে না? যদি হয়? অনেক সময় অসম্ভবও তো। ওর হয়তো কোনো অতৃপ্তি আছে, যেরকম ছটফটে ভাব—। আসলে তা-ও নয়। যেটা ওর সারল্য, যেটা ওর পবিত্র মনের চঞ্চলতা, সেটাকেই আমি অতৃপ্তি ভেবে।

হঠাৎ নিজেকে আমার একটা লম্পটের মতন। সকালবেলা উঠেই এক নিরীহ দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী সম্পর্কে। যেন কোনো মহিলা অপরের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই ব্যভিচারে রাজি হবে। ইডিয়েট! আমি নিজের গালে ঠাস করে এক চড় কশালাম। তবু মনের মধ্যে একটা ছুঁকছুঁকে ভাব। যখন নিজেকে আরো শাস্তি দেবার জন্য সকালবেলা সিগারেট খাবই না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং আরো ঠিক করলাম স্বামীনাথন-পদ্মার সঙ্গে দেখা না করেই।

পরিতোষরা গেছে ছিপাদহের দিকে। আমি ওদের খোঁজে অনায়াসেই। এদিককার পথঘাট আমার খুব অচেনা নয়। হিটারে গরমজল চাপিয়ে ততক্ষণে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে। এত ভোরে বহুদিন দাড়ি কামাইনি।

সদর দরজাটায় তালা লাগিয়ে দাঁড়ালাম। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। স্বামীনাথনরা এখনো। একটা খামের মধ্যে চাবিটা ভরে, সেই খামেরই গায়ে কয়েক লাইন লিখে সেটা ওদের লেটার বক্সে। যাক, নিশ্চিন্ত। এবার বড়ো রাস্তায়।

মনের মধ্যে একটা কাপুরুষ-কাপুরুষ ভাব। যেন আমি পালিয়ে, হেরে। কোথায় পালাচ্ছি? আত্মসংযমীকে বীরপুরুষ বলা উচিত না? কেউ তো ব্যাপারটা জানল না। তা হলে হয়তো কিছু প্রশংসা। তার বদলে, মনে মনে বলছি, শালা, ভীতু কোথাকার—পদ্মা মেয়েটার ছলাকলা দেখেও।

বাস ছাড়তে এখনো দেরি আছে। একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে। যাবে বেতলায়, পথেই ছিপাদহ। দু'টাকার রফা। আমি উঠে ড্রাইভারের পাশে।

ট্রাকটা বহুদূর থেকে আসছে, সারারাত ধ'রে। ড্রাইভারের চোখ দুটো লাল। গলায় একটা মাফলার। তার পাশে বসে ক্লীনার, একটা অসম্ভব রোগা ছেলে, দেখলে কিছুতেই ঠিক বয়েসটা। ক্লীনার শব্দটাই কি রকম রোগা-রোগা।

পেছনে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে বসেই

চুলছে। ড্রাইভারের পেছনে একটা চৌকো ফুটো, সেখান দিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওদের দিকে। দৃশ্যটা কি রকম যেন করুণ করুণ। ওরা সারা রাত্রি এইভাবে! ড্রাইভারের মুখখানা এমনই রুক্ষ, যেন মনে হয় দস্যুদলের সর্দার।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস। অনেকগুলো মাছি ভনভন ভনভন। অসম্ভব দ্রুত চলছে ট্রাকটা, তবু মাছি, ড্রাইভার মাঝে মাঝে স্টিয়ারিংএর ওপর থেকে হাত ছেড়ে, মুখের সামনের মাছিগুলোকে। ভয়-ভয় করে। যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট। এত মাছি কেন? তাড়ি-টাড়ি খেয়েছে নাকি? সেই গন্ধে মাছি? তা'হলে তো আরো সাঙ্ঘাতিক।

ক্লীনার ছেলেটাও ঘুম ঘুম। মাঝে মাঝে আমার কাঁধের ওপর। ছেলেটার কষে লালা। ক্রিমির দোষ আছে নিশ্চিত। আমি হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে।

সবে আলো ফুটছে। দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ল্যাজ গুটিয়ে একটা শিয়াল। বাঁ পাশে শিয়াল দেখা কিসের যেন লক্ষণ? শুভ না অশুভ? আমি দূরে চলে যাচ্ছি ক্রমশ! পদ্মাকে আর জীবনে কখনো হয়তো! কী সুন্দর কোমর! বাঁধিয়ে রাখার মতন। ঐ সৌন্দর্য দূরেই থাক। স্পর্শের বদলে চোখে।

একটা ছোট নদীর ওপর সরু ব্রীজ। ট্রাকের গতি ক্রমে কমে। ভোরের হালকা আলোয় ক্ষীণ নদীটি অপরূপ। এইসব অচেনা পাহাড়ী নদী দেখলেই আমার মনে হয়, এরা বড্ড একা। দিনের পর দিন চুপচাপ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। কেউ কি কখনো এখানে গাগরীতে জল ভরতে? দাপাদাপি করে না শিশুরা। বালির ওপর দিয়ে তিরতিরে জলধারা।

নদীটি অবশ্য তখন একা ছিল না। ব্রীজের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। হাত উঁচু ক'রে। ট্রাকটা বেশ জোরে ব্রেকের শব্দ। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে। তারপর দুর্বোধ্য হিন্দীতে ড্রাইভারকে কি যেন। ড্রাইভারও উত্তরে সেই রকম। তারপর লোকটি একতাড়া নোট। ড্রাইভার সেগুলো না গুণেই জেবের মধ্যে ভরে আমাকে বলল, একটু উঠুন তো বাবুজী।

উঠে দাড়ালাম। সিটের গদি সরাতেই ভেতরে একটা বাক্সের মতন। তাতে কয়েকটা পুটলি। ড্রাইভার দুটো পুটলি তুলে রাস্তার লোকটার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছি সেই পুটলি দুটো অনুসরণ করে।

মনের মধ্যে একটা খটকা। কি এমন মাছি-ভনভনে বস্তু, যার বিনিময়ে অতগুলো টাকা? আমার কৌতূহলী চোখ একবার ড্রাইভারের দিকে, একবার সেই লোকটার।

আরো দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাক আবার। এখনো কয়েকটা মাছি। কী যেন আমার মনে পড়বার কথা। কেউ একবার বলেছিল, ট্রাকে যদি মাছি থাকে।

উল্টো দিক থেকে একটা সরকারি জীপ। ট্রাক ড্রাইভার আমার দিকে একবার আড়চোখে। সেই দৃষ্টিতে অপরাধ। তৎক্ষণাৎ আমার মাথার মধ্যে চিড়িক করে। আফিং। নিশ্চিত আফিং। ধানবাদে সেই যে একবার। চৌধুরীদা ছিলেন একসাইজের লোক।

ট্রাকটা জীপটাকে পথ ছাড়ল না। নিজেই জোরে বেরিয়ে।

আমি আমার কাঁধ থেকে ক্লীনারের মাথাটা ঠেলে তুলে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এ লোকটাও আফিং খেয়েছে নাকি?

ড্রাইভার সচকিতভাবে জিজ্ঞেস করল, কেয়া?

—মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে ভি আফিং খায়া?

ক্লীনারটা চোখ খুলে মিটিমিটি হাসছে। বোধহয় আমার হিন্দী বলার কসরৎ দেখেই। আব একটু কৌতুকের জন্য আমি বললাম, আফিংকা কারবার মে কিৎনা নাফা হোতা হ্যায়?

ড্রাইভারের মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরল। রক্তচক্ষু। লোকটির কোনো কৌতুকবোধ! কর্কশ গলায় বলল, আফিং কা কেয়া বাৎ হ্যায়?

—ওঁ চীজ কেয়া? আফিং নেহি?

—উও তো তামাক হ্যায়।

—ভোরবেলা রাস্তায় খাড়া হোকে, ইৎনা রূপিয়া দেকে আদমি লোক তামাক খরিদ করতা হ্যায়? তব ইৎনা মচ্ছর কাঁহে?

—মচ্ছর?

মচ্ছর মানে মশা না মাছি? বোধহয় মশা-ই। তা হলে মাছির হিন্দী কি? যেমন বোলতার হিন্দী জানি না। এই নিয়ে তারাপদর রসিকতা, আপলোক বোলতা কো বোলতা নেহি বোলতা হ্যায় তো কেয়া বোলতা হ্যায়?

সেই রসিকতাটা ওদের শোনাব শোনাব, তখন ক্লীনারটি হঠাৎ রেগেমেগে এক চীৎকার, এইজন্যই বলছিলাম, বাঙালি বাবুদের কক্ষনো তুলতে নেই।

ড্রাইভারটি তাকে জানাল, সুবৎ দেখে আগে বুঝিনি যে এ বাঙালি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক। উতার যাইয়ে।

—অ্যা?

—উতার যাইয়ে।

বলে কি এরা? এই মাঠের মধ্যে নেমে যাব? এরা আফিং চোরাচালান করে, তাতে আমাব কি? আমি কি কোনো আপত্তি? শুধু একটু রসিকতার জন্য।

ড্রাইভারটির চোখ দেখে রীতিমতন ভয়ে গা ছমছম। গুটিগুটি নেমে পড়তেই। ক্লীনারটি আমার হাত চেপে ধরে বলল, রূপিয়া?

কোনো তর্কের মধ্যে না যাওয়াই। দু' টাকাই ওদের। এবং বললাম, নমস্তে। বাকি সব টাকাও যে কেড়ে নেয়নি, সে তো ওদের দয়া। শুধু মাঝরাস্তায় এমনভাবে ফেলে।

একবার ভেবেছিলাম ট্রাকের নম্বরটা। পকেট থেকে কলম বার করেও মত বদল। পুলিশকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। পুলিশকে না জানিয়ে কেউ কক্ষনো চোরা কারবার করে নাকি? মাত্র দু'টাকা অতিরিক্ত লাভের জন্য যে আমাকেও এরা ট্রাকে জায়গা। অতিরিক্ত দুঃসাহসী না হলে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সকালের প্রথম সিগারেট। ইচ্ছে করলে এখনো পরিতোষের বিছানায়। শুধু শুধু একটা স্বপ্নের জন্য।

কাছাকাছি বাড়িঘর কিছু নেই। বিরাট ফরাসের মতো মাঠ। পরবর্তী কোনো ট্রাক বা বাসের জন্য কতক্ষণ? তার চেয়ে বরং হাঁটতে হাঁটতেই। ছিপাদহ আর কতদূর?

আধঘণ্টা মতন হাঁটার পর দূরে একটা কালো গাড়ি। প্রায় মাঝরাস্তাতেই হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাহ্য করল না গাড়িটা, একরাশ ধুলো উড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে আমি সরে না দাঁড়ালে হয়তো চাপা দিয়েই। আমার চেহারাটা কি যথেষ্ট বিপন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়?

আবার হেঁটে হেঁটে এক দিগন্ত মাঠ পার হবার পর দ্বিতীয় দিগন্তে কিছু ঘরবাড়ি। খাপরার চাল। ছোট একটি গ্রাম। যদি ওখানে চা। স্বামীনাথন কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, চমৎকার মানুষ। ওরা দু'জনেই চমৎকার। শুধু আমারই দুর্ভাগ্য।

একটি ঘরের দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি এত শাদা যে মনে হয় ওর বয়েস অন্তত দু'শো বছরের কম নয়। প্রথমে তাকে আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার। তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। ঘরের দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনার সরকারি বিজ্ঞাপন।

জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?

বৃদ্ধটি নির্বিকার। নিরুত্তর।

দু'তিনবার প্রশ্ন করে একই। তখন জানতে চাইলাম, ছিপাদহ কতদূর?

বুড়োটা নিশ্চয়ই কালা। কিংবা কোনো উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। দুচ্ছাই, এত বুড়ো-ফুড়ো দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বাড়িতে কি আর কেউ নেই? উঁকিঝুঁকি দিয়েও আর কারুকে।

খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ি। শালিক পাখির মতন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে দুটি শিশু। একজন মাঝবয়েসী লোক পেঁয়াজের ক্ষেতে কোদাল দিয়ে। পাশের

একটি চালার নিচে একটি গরু বাঁধা। যথারীতি খড়ের বাছুর। একজন স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়ি নিয়ে সেই দিকে।

অল্প খানিকটা জমিতে নধর পেঁয়াজকলি। আমি সেখানে। পুরুষটি একবার শুধু মুখ তুলে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে আবার। তার পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু একটিও স্বাস্থ্যবান পুরুষ দেখি না।

—ইধার চা-কা দুকান হ্যায়?

লোকটি সিধে হয়ে আমার দিকে ভালোভাবে। কোদালের ফলাটা কি চকচকে!

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? (হিন্দীতে)

—এইসাই ঘুমতা হ্যায়।

—ঘুমতা হ্যায়?

লোকটির বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝতে পারি। সদ্য সকালে একজন ফিটফাট বাবু চেহারার লোক এই গ্রামে। সচরাচর তো।

—এদিকে চায়ের দোকান নেই?

—না, বাবু।

—আপলোগ চা নেই পিতা?

—হাটে গেলে কোনো কোনো দিন খাই। এদিকে তো কোনো দোকান নেই।

অনেকখানি হেঁটে আমি একটু ক্লান্ত। সকালবেলা চায়ের জন্য বুকের ভেতরটা টাস টাস। চা না খেলে সিগারেট জমে না।

চ্যাঁ—চোঁ—চ্যাক—চ্যাক আওয়াজে দৃষ্টি ফিরিয়ে! স্ত্রীলোকটি দুধ দুইছে। গরুটি শান্তভাবে। মুখে জাবর, ডান উরুতে দুটি মাছি, সেই জায়গার চামড়াটা কুঁচকে কুঁচকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়া দেখতে বেশ। স্ত্রীলোকটি এ কাজে বেশ নিপুণা। এই জন্যেই মেয়েদের আর এক নাম দুহিতা। অনেকদিন আমি এ-রকম কাছে থেকে দুধ দোয়া।

হাঁড়িটা প্রায় ভরো ভরো। অনেকটা দুধ তো। এরা গরীব হলেও বেশ একটা ভালো গরু।

—আপলোগ ইতনা দুধ কেয়া করতা হ্যায়? বেচনা হ্যায়?

—হ্যাঁ বাবু, বিক্রি করি।

—কাঁহা?

—ছিপাদহে।

—ছিপাদহ কিৎনা দূর হ্যায় হিঁয়াসে?

লোকটি হাত তুলে বলল, কাছেই।

সে দেখাল দূরের এক 'ধূধূ'র দিকে। এদের 'কাছেই' মানে অন্তত দু'তিন মাইল। কিন্তু আর উপায় কি?

মধুর শব্দে দুধ দোয়া তখনো। হঠাৎ শেষ হলো। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে শিশু দুটিকে। শিশু দুটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে। স্ত্রীলোকটি একটা পোয়ামাপের কাঁসার গেলাস হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে ওদের একজন একজন করে। বাচ্চা দুটি চোখের নিমেষে। স্ত্রীলোকটি তারপর এক গেলাস পুরুষমানুষটিকে। আমি খুবই অবাক হয়ে। এরকমভাবে কাঁচা দুধ খেতে কাকুকে দেখিনি। তাও গেলাসটা কলসীর মধ্যে ডুবিয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ের লেখকরা এ দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে!

পুরুষটি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবুজী, আপনি কি একটু দুধ খাবেন? লাল রঙের গরু, এর দুধ খেলে খুব তাগৎ হয়।

আমি শশব্যস্তে বললাম, নেহি, নেহি, বহুৎ মেহেরবানী আপকা—

লোকটি তখন খুবই পেড়াপেড়ি। স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে আর এক গেলাস। আমি বার বার আপত্তি জানিয়েও।

একটি খাটিয়া আনা হলো আমার জন্য। আমি গেলাসটা হাতে করে একটুক্ষণ। বলতে পারতাম, দুধটা যদি একটু গরম করে। সঙ্কোচ হলো। এরা যদি কাঁচা দুধ খেতে পারে তাহলে আমিই বা।

আস্তে আস্তে চুমুক। প্রথমে একটু বুনো বুনো গন্ধ। কিংবা কাল্পনিক। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লেগে যায়। স্ত্রীলোকটি ব্যগ্রভাবে আমাকে।

স্ত্রীলোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক কিংবা পঁচিশ-ছাব্বিশ—ঠিক বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যটি দৃঢ় কিন্তু মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম। চোখ দুটিতে বিস্ময় এবং স্নেহ এখনো তবু।

হঠাৎ আমার চোখে জল এসে যায়। এক অভূতপূর্ব মমতাময় ভালোলাগার স্পর্শ। কোথায় একটা অচেনা গ্রামে, একটা অচেনা বাড়িতে, জীবনে প্রথম টাটকা কাচা গরুর দুধ ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে। এদের এত আন্তরিকতা! এতটা কি আমার পাওনা ছিল? আমি কার জন্য কি করেছি? যদি এখনো অন্য কারুর জন্য। যদি কখনো অনুরাধাকে।

অনুরাধার কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে টনটন। আর কি কখনো দেখা? ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে সে কোথায় হারিয়ে। কেন তাকে আমি এমনভাবে হারাতে? সে যে আমার খুবই আপন।

দুধটার জন্য পয়সা দেব কি না এই নিয়ে মনের মধ্যে। ভারতীয় আতিথ্য বলে একটা কথা আছে। দারিদ্র্য তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভারতীয়। একটুক্ষণ

অপেক্ষা করি। তারপর বলি, এক অনজানে মেহমান কে লিয়ে আপলোগ কা বহুৎসা দুধ খরচা হো গিয়া—

আমার হিন্দী শুনে এরা হাসে না—ভাষা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কথাটা সবটা বুঝতে না পারলে দু'এক পলক মুখের দিকে।

লোকটি একটু পরে জানাল যে, ওর ভাবী তো এক্ষুনি ছিপাদহে যাবে দুধ বেচতে, সুতরাং আমিও তার সঙ্গে। আমাকে রাস্তা চিনিয়ে।

এতক্ষণ বাদে আমি ওর নামটা। আশ্চর্য, ওর নাম সাহেবরাম। দু'তিনবার শুনেও বুঝতে পারিনি। সাহেবরাম? কি আশ্চর্য মিলন। এখানে ঠাকুর-দেবতার নামেই এদের নাম রাখার রেওয়াজ। এর একসঙ্গে দই দেবতা।

আমি তার মাটি-বাঙা পিঠে আমার একটা হাত। কি ঠাণ্ডা। এদের গা এত ঠাণ্ডা হয় কেন?

স্ত্রীলোকটির আঁচলটা গাছকোমর। হাঁড়ির মাথায় একটা পাতলা কাপড় বেঁধে বলল, চলুন।

সে মাঠের মাঝখান দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ চেনে। আমি তার পিছু পিছু। দু'জনেই নিঃশব্দ। সে এত দ্রুত যায় যে আমাকেও হনহন করে।

একটা ছোট্ট ডোবার পাশে দুটি তালগাছ। অল্প ছিরছিরে জল। তালগাছ দুটি যেন দুই প্রহরী। কিংবা বন্ধু। চিরকাল জল দেখলেই আমার। এবার দৌড়ে গিয়ে পা ডুবিয়ে।

—মায়ি, একটু দাঁড়াবে?

স্ত্রীলোকটি দাড়াল ঠিকই, ভুরুতে বিরক্তির রেখা। হয়তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে দুধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এল। এ তো দুধে জল মেশালো না? আমার সামনেই তো সবকিছু। দুধে জল মেশাতে জানে না। শিখিয়ে দেব? এই ডোবার জলই বা মন্দ কি? হাসি পেল। এসব বাঙালি চিন্তা।

ডোবার জলে পা ছোঁয়াতেই খুব আরাম। কাছেই দু'তিনটে ব্যাঙ। যেন এদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, দেখা না করে চলে গেলে খুবই। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে। পা দিয়ে জল ছলচ্ছল শিশুর মতন। অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটানো যেত। তবু উঠে আসতে।

আবার যাত্রা। এর মধ্যেই মাইলখানেক অন্তত। সারাটা পথ কোনো কথা না বলে কি?

—মায়ি, তুমি রোজ দুধ নিয়ে যাও?

—জী।

—কখন ফেরো?

—তিন বাড়িতে দুধ মেপে দিয়ে ফিরে আসি।

—যেদিন বৃষ্টি হয়? সকালে যদি বৃষ্টি হয়?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি ওকে অকারণে ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ছেলেমানুষি।

কিন্তু আকাশ হঠাৎ কালো। কোথা থেকে মেঘ। যদি হঠাৎ এক্ষুনি বৃষ্টি নামে, আমরা দু'জন কোথায়? কাছাকাছি আর বড়ো গাছও নেই। সেই ডোবাটার কাছেই ফিরে যেতে। দু'জনে দুটো তালগাছে হেলান দিয়ে। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি এল না। মাঠ ভেঙে আমরা বড়ো রাস্তায়। অদূরে কিছু কিছু বাড়িঘর। এবং চায়ের দোকান। আর আমি চা না খেয়ে এক পা-ও। আমার পথপ্রদর্শিকাকে কি এক কাপ চা?

—মায়ি, চা খাবে?

এবার মুখটা পাশের দিকে ফিরিয়ে সে অদ্ভুত লজ্জার সঙ্গে হাসি চেপে। মুহূর্তে সে খুকির মতন। এই মুখখানা যদি কোনো ছবিতে।

ফুলুরি ভাজছে। চায়ের সঙ্গে বেশ। এখন যদি আমার পথের সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে চা ও বিশ্রম্ভালাপ। জানি, তা হয় না। শহরে জন্মায়নি বলেই এই নারী ইহজীবনে কোনো চায়ের দোকানে।

আমার কাছ থেকে কোনো রকম বিদায় না নিয়েই সে হনহনিয়ে। এটাই স্বাভাবিক। আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করিনি। এই নাম-না-জানা রমণীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু সারা জীবনের জন্য।

পর পর দু'গেলাস চা। ছোট ছোট গেলাস, ঠিক জমে না। ফুলুরিও বিস্বাদ, সম্ভবত তিল তেলে। দোকানে আমিই একমাত্র। উনুনে বড্ড ধোঁয়া।

সরকারি বিশ্রাম ভবনের সন্ধান জেনে উঠে দাঁড়িয়ে। বেশি দূর নয়। এখানে অনেকেই কাঠের কারবারী। কয়েকটা বেশ ভালো বাড়ি। সার সার ট্রাক বিশ্রামরত। শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধ। আমার ক্লান্ত পা।

বাংলোটা একদম উঁচুতে। কাঠের গেটের পরে খানিকটা বাগান। তারপর চওড়া বারান্দা, সেখানে পরিতোষ আর তার স্ত্রী, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। চমকে দিতে হবে। নিঃশব্দে কাঠের গেট খুলে আমি গুটিগুটি।

হয়তো পিঠে কিল মেরেই বসতাম, তার আগেই। পরিতোষ তো নয়। অচেনা স্বামী-স্ত্রী। কোনো সাড়াশব্দ না করে এতটা কাছে চলে আসা খুবই। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ।

লোকটি কোনো প্রশ্ন করার আগেই আমি পরিতোষের নাম।

লোকটি স্নায়ু শিথিল করে ইংরেজিতে জানাল, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ব্যানার্জী

তো একটু আগেই...

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পরিতোষের সম্পর্কে। আজ সকালেই ওরা গেছে বেতলা। সেখানেও থাকতে পারে, অথবা। আমি কি এখন পরিতোষের খোঁজে বেতলায়? বেতলায় চমৎকার জঙ্গল। জীপ নিয়ে ঘুরলে হরিণের পাল, কখনো বাঘ কিংবা হাতিও, দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেখানেও গিয়ে দেখি পরিতোষ ইতিমধ্যে আবার? এখন এইভাবেই পরিতোষকে খুঁজতে খুঁজতে আমার সারা জীবন।

একটু হাসি পায়। ঠিক যেন গেছোবাবা। আমি যাই উত্তরে তো সে দক্ষিণে। আমি টালা গেলে সে চেতলায়। তা ছাড়া আমি পরিতোষকে এত খুঁজছিই বা কেন? কলকাতা থেকে বেরুবার সময় তো।

মনস্থির করে ফেলি। এবার ফেরার পালা।

অচেনা দম্পতি ভদ্রতা-মেশানো চা আমার জন্য। আমি প্রত্যাখ্যান। আমি ওদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন আমায় এখনই পরিতোষের খোঁজে।

বাংলো ছেড়ে হেঁটে এসে রাস্তার ওপরে। আর ট্রাক নয়। এদিকে দিয়ে বাস যায় জানি। এক-ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পর পর।

একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ। ঘড়ি নেই, কতটা সময় কাটল জানি না। কটা সিগারেট খরচ হলো সেই অনুযায়ী সময়। এক প্যাকেটে যদি দু'ঘণ্টা চলে তাহলে সেই হিসেবে সাতটা সিগারেটে প্রায় দেড়ঘণ্টা। একা থাকলে অবশ্য একটু বেশি ঘন ঘন।

যেন আমার জীবনের দেড়ঘণ্টা আয়ু ছিপাদহের এক গাছতলায় খরচ করার কথা ছিল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ঝগড়ায় মত্ত এক ঝাঁক ছাতারে পাখি। এই দৃশ্যটিও নির্দিষ্ট আমারই জন্য। পর পর তিনটি নারীচরিত্র বর্জিত মোটরগাড়ির ঠিক এই সময়েই এই রাস্তা দিয়েই।

একটু একটু বিরক্তির ভাব আসাতেই আমি তাড়াতাড়ি সতর্ক। না, বিরক্ত হলে চলবে না তো। পদ্মপাতায় টলটল করছে জল, কখন গড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, এর মধ্যে আবার বিরক্তির সময় নষ্ট? তার বদলে গুনগুন করে একটা গান। ধারে কাছে কেউ না থাকলেই আমি ভরসা করে একটু গান গাইতে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা কিশোরী মেয়ের অভিমানী মুখ। কেন এই মুখটা ভুলতে পারছি না? ট্রেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। এরকম তো আরো কতবার। অনুরাধা, শুধু এই নামটা জানি, আর ওর সম্পর্কে কিছুই না। হলুদ ফ্রক পরে শুয়েছিল বাঙ্কের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জলের রেখা। ওর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হবার কথাই নয়। তবু যদি এখনো। হয়তো এখনো।

বহুদূরে বাসের চেহারা। আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে। তখন চোখে পড়ল, খুব কাছেই, উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে কলসী মাথায় সেই স্ত্রীলোকটি। সাহেবরামের ভাবী। দুধ বিক্রি শেষ। দু'একবার আমার দিকে চোখ। কোনো কথা নেই।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মায়ি, ঘর যা রহা হ্যায় ?

যেন কতকালের চেনা। সে নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে। আমি তার গাম্ভীর্য ভাঙার চেষ্টা করি। হালকা গলায় আবার বলি, সব দুধ খতম ? থোড়া সে দেওনা হামকো ?

সে এবারও কথা বলে না। তবে হাসে। একটা হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, নেই, নেই।

ওর সঙ্গে ওদের গ্রামে আবার ফিরে গেলে কেমন হয় ? থেকে যাব সাহেবরামদের বাড়িতে। খাটব সবজি ক্ষেতে। সকালবেলা কাঁচা দুধ। বিকেলে মহুয়া। একটা ইস্কুল খুলে মাস্টারবাবু হয়ে বাকি জীবনটা ?

বাস এসে ওকে আড়াল করে দাঁড়ায়। আমি আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায়। এই গ্রামে তিনদিনের বেশি চারদিন থাকতে হলেই পাগল হয়ে। ওসব কল্পনাতেই।

আঃ, বাসটা কি এই সময় একটু খালি থাকতে পারত না ? একটা বসবার জায়গা ? গিসগিসে ভিড়। এত লোক সকালে উঠেই কোথায় যায় ? আমি দেড়ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে তীব্র মানুষ-মানুষ গন্ধ। যদি রাক্ষস হতাম, সব কাটাকে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই একজোড়া বরবধূ। বউটি বসবার জায়গা পেয়েছে, বর দাঁড়িয়ে। বরের কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা। যেন বাসরশয্যা থেকে সোজা উঠে এসে। দৃশ্যটার মধ্যে খানিকটা যেন ট্র্যাজিক সুর মেশা। নতুন বউয়ের মুখটা অবিকল নতুন বউয়ের মতন। হয়তো পরশু দিন পর্যন্ত ও ছিল কুলি-রমণী, আবার কাল পরশু থেকে। মাঝখানে এই একটা দুটো দিন ওর মুখটা একেবারে আলাদা। ওদের জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ অর্থাৎ অন্তত একটা টাঙ্গা যদি। শুধু আজকের জন্য। আজ ওদের খানিকটা আলাদা সম্মান। তবু কেন বাসে ? হয়তো দরদ্ব আরও বেশি।

ডালটনগঞ্জ আসতেই নেমে। এখান থেকে আবার ট্রেন। বেশ গরম। একবার স্নান করতে পারলে। স্টেশনের প্লাটফর্মে একটা কলে দু'জন লোক। আমি লোকজনের চোখের সামনে কিছুতেই।

চট করে পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে ? স্বামীনাথনরা যে রকম সহৃদয়, আমাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই খুব খাতির-যত্ন। অনায়াসে ওখানে স্নানটান করে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে।

সেদিকে পা বাড়িয়েও ছিলাম। আবার থমকে। এখন দুপুর। স্বামীনাথন নিশ্চয়ই অফিসে। দুপুরবেলা একা পদ্মা। শরীরে আলতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে খেলে। হয়তো মেয়েটি খুবই ভালো, সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, শুধু শুধু আমার লোভ। নির্জন দুপুরে একটি ভালো মেয়েকেও আমি।

ফিরে এলাম। কয়েক মিনিট বাদে আবার। মনটা চঞ্চল হয়ে অবাধ্য। গেলে ক্ষতি কি? মেয়েটি বড্ড সুন্দর। শুধু চোখে দেখতেও। কিন্তু তা হয় না। চোখ অস্থির গর্জন করবে। শরীর যেন চুম্বক, কিছুতেই কাছাকাছি না এসে।

অতিকষ্টে নিজেকে দমন করতেই। একটা যেন দারুণ বীরত্ব। আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে যাওয়ার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেখানেও।

স্নান হলো না। একটা দোকানে খেয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে লম্বা ঘুম।

ডেহরি-অন-শোন-এ পৌঁছতে পৌঁছতে রাত। এক্ষুনি বম্বে মেল। টিকিট কেটে উঠলেই সোজা কলকাতা। এবারের মতন ভ্রমণ শেষ।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ। আমাকে অন্য কোথায় যেন। না গিয়ে উপায় নেই, যেতে হবেই হবেই, হবেই হবেই। কথা দেওয়া আছে। কার কাছে? নিজের কাছেই, আবার কার?

একটা শেয়ারের ট্যাক্সি তখনই ঔরঙ্গাবাদের দিকে। উঠে জায়গা করে। চোখ খর করে সব সময় বাইরে। পেরিয়ে না যায়। জায়গাটা ঠিক যদি চিনতে না পারি। না চিনলে আর আপশোষের। সুলেমানপুরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রোখকে, রোখকে।

কেউ জানে না কেন আমি সুলেমানপুরে। অন্য লোকরাও অবাক। একজন জিজ্ঞেস করল, এখানে কার কাছে যাবেন? উত্তর দিলাম না। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ট্যাক্সিটা দূরে মিলিয়ে। আর কোনো উপায় নেই। এবার আমি একা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এ জায়গায় আগে কখনো আমি। কারুকে চিনি না। শুধু একটা নাম জানি, অনুরাধা। এই নামটা শুধু সম্বল করে কোথায় যাব। কোথায়?

তবু এখানেই।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

এই শহরে এখন কে আমাকে আশ্রয়? কোথাও কোনো হোটেল কিংবা। রাত্তিরটা অন্তত।

যে-কোনো একটি বাড়িতে গিয়ে কি? যদি বলি, আমি পথিক, যদি আমাকে একটু। সেসব দিন এখন আর নেই। অচেনা লোককে কেউ অতিথি করে না।

শুধু তারাই আশ্রয় দেয় যারা পয়সা নেয়। রূপকথার গল্পের মতন কোনো বাড়ির জানলা থেকে এখন কেউ যদি আমাকে হাতছানি দিয়ে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বন্ধ দোকান। সম্ভবত বাজার। একটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীণ আলো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা।

—শুনছেন। এই যে, শুনছেন।

প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। কথাবার্তা থেমে। আমি আবার টিনের দরজায় ঢকঢক শব্দ।

—কে?

—একটু খুলবেন?

দরজা সামান্য ফাঁক। এটা একটা ভাতের হোটেল। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো ওল্টানো। এক কোণে নিজেদের লোকেরা খাবার-টাবার নিয়ে—

—কি চাই?

—কিছু খাবার পাওয়া যাবে?

—না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

—শুনুন না, একটু খুলুন—

একটি মহিলাকণ্ঠ লোক এগিয়ে এসে বলল, কি বলছেন কি?

সেই বিরাট লোকটির সামনে আমি প্রায় চুপসে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললাম, আমি একটু থাকা আর খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলাম।

—কোথা থেকে আসছেন?

—এমনিই ঘুরতে ঘুরতে। এখানে আর কোনো হোটেল নেই?

- না। ঔরাঙ্গাবাদে চলে যান।

- সে তো অনেক দূর। আপনার এখানে একটু থাকার জায়গা।

লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব ভালোভাবে সন্দেহাকুল চোখ। অবিকল বাংলা প্রজ্ঞাতকলশাল।

—এখানে কি জন্য এসেছেন?

চট করে উত্তর দিতে পারি না। সম্বল মাত্র একটি নাম। অনবাবা বসুমল্লিক। একটি কিশোরীর নাম করে কি কোনো খোঁজ?

—এদিকে জমির খোঁজে এসেছিলাম।

—জমি?

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম এদিকে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ট্রাকি ব্রেকডাউন হয়েছিল, পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখলে কি জমি কেনা মানুষ বলে? তবু যদি ওরা ভাবে আমার সঙ্গে অনেক টাকা। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি আবার বলি, জমি কিনে একটা

ফ্যাকটরি হবে, আমার মামার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

—জাঠমলের কাছে খোঁজ করুন।

—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় থাকা যায়? আপনার হোটেলে ঘর নেই?

—এটা থাকার হোটেল নয়, শুধু খাওয়ার।

দু'জন অল্পবয়েসী বেয়ারাও বাইরে এসে। একজন বলল, ডাকবাংলোতে যান।

—কত দূরে?

—দু' আড়াই মাইল।

—এত রাত্রে সেখানে যাব কি করে? গিয়েও যদি জায়গা না পাই? আপনার ওই টেবিল দুটোর ওপরে যদি শুয়ে থাকি?

ভবিষ্যৎ ফ্যাকটরি মালিকের ভাগ্নের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাশা করা যায় কিনা, ওরা সেটা ঠিক বুঝতে। এ ওর মুখের দিকে। দীর্ঘকায় লোকটি বলল, ওটার ওপরে এই ছেলেরা শোয়।

—আর কোন জায়গা নেই? যদি একটু সাহায্য করেন।

ওরা নীরব। আমি যেন বেশি বাড়াবাড়ি। সামান্য রাত্রে ঘুমোবার জন্য। বৃষ্টি নেই, মাঠে-ঘাটে গাছতলাতেই তো। আমার তো নেই বাটপাড়ের ভয়। আসলে হয়তো, এই বিকেটি হোটেলের নড়বড়ে কাঠের টেবিলে শোওয়ার জন্যই আমার লোভ। ওই জায়গাটাই আমার চাই। এ-রকম অসঙ্গত লোভ আমার মাঝে মাঝেই। যেন ওই জায়গাটা না পেলে কিছুতেই আজ আমার ঘুম।

ছেলে দুটি স্থানচ্যুত হতে চায় না। একজন বলল, পদমজীর বাড়িতে ইবিগেশানের বাবুরা ছিল কিছুদিন।

—দ্যাখ তো সেখানে ঘর খালি আছে কিনা।

একটি ছেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে। পদে পদে হোচট খাওয়ার ভয়। কোথা থেকে কোথায়। কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আর আজ। সুখের বিছানা ছেড়ে এই মাঠের মধ্যে। এই অনিশ্চয়তায় আমার দারুণ আরাম।

একটা লম্বা স্কুলবাড়ির মতন। অনেক ডাকাডাকি করে পদমজীকে। টকটকে লাল চোখ। আশু মুখুজ্যের মতন গোঁফ। বোঝা যায় সন্ধে থেকেই গাজা।

ছোট ছেলেটি আমার সমস্যা বুঝিয়ে বলায় সে কোনো রকম বিস্ময় দেখায় না। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, তিন রুপিয়া চার আনা রোজ।

রেট যথেষ্ট বেশি। সাধারণ হোটেলেই চার টাকা। তবু দরাদরি না করে আমি একটা দশটাকার নোট। এবং কিছু চিন্তা না করে বললাম, তিন রোজকা।

ঘরটা বিস্ময়কর রকমের পরিষ্কার। ধপধপে শাদা দেয়াল, মাঝখানে একটি খাটিয়া। সব মিলিয়ে বেশ একটা শুকনো টাটকা ভাব। এতটা আশা করিনি।

ছেলেটাকে বিদেয় দিয়ে আমি অবিলম্বে শুয়ে। আজ রাতের মতন পেটে কিল মেরে।

কোথায় কখন থাকি, তার ঠিক নেই। তবু এই ঘরটা কেন তিন দিনের জন্য? যেন এখানে একটা চুম্বক আছে। আমাকে টেনে রাখছে।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট গোলমাল। গাজাখোরদের হল্লা। কখনো একটি স্ত্রীলোকের সরু কণ্ঠস্বর। তবু আমি না উঠে। অচেনা জায়গায় বেশি কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।

সকালে উঠেই চায়ের জন্য। এখানে চা পাওয়া যায় না। যেতে হবে বাজারে। একেবারেই বেরিয়ে পড়া যাক। মুখটুক ধুয়ে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে।

চা খাওয়ার পর আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলি। শুধু একটা নাম। ওতে কোনো লাভ নেই। যুবকটিরও পদবী যদি। সুতরাং সারা শহরটা টহল মেরে। যদি হঠাৎ।

শহরটা ছোট। বাজার আর কিছু খুচরো দোকান, ছড়ানো ছেটানো বাড়ি। একটা তিরতিরে নদী। রেল স্টেশন ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

মন্থরভাবে প্রতিটি রাস্তা দিয়ে। প্রতিটি বাড়ির দিকে সতর্ক চোখ। দরজার দিকে, জানলার দিকে। বাড়ির পেছনের উঠোনে। যে-কেউ আমাকে ভাবতে পারে পুলিশের লোক।

কেন আমি এ-রকম করছি? কেন ঐ মেয়েটিকে? নিজেই জানি না। মেয়েটিকে খুঁজে পেলেই বা কি লাভ? জানি না। আমি তাকে কি বলব? জানি না। হঠাৎ কেউ আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর? জানি না।

অন্তত তিনবার গোটা শহরটা চষে ফেলে। এখানে বাঙালিই প্রায় চোখে পড়ে না। এমন হতে পারে ওরা এর মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে। কিংবা এই রেল স্টেশনে নেমে দূরের কোনো গ্রামে। তাহলে আমি এখানে কি করছি? তিন দিনের জন্য ঘর ভাড়া।

একটা বাড়ির দিকে আমার বার বার চোখ। পুরোনো বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালে আইভি লতা। বাড়িটার গেটে বাংলা অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী কুঠী'। এরা বাঙালি। সুতরাং এখান থেকে কোনো রকম খবর হয়তো। কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে বসুমল্লিকদের কি আত্মীয়তা? জানি না। একজন প্রৌঢ় লোককে সে বাড়ির সামনে কয়েকবার। বেশ রাশভারী চেহারা। বাড়িটার পেছনে ঘন ঘন মুরগির ডাক। বেশ কয়েকটা মুরগি আছে বোধহয়।

প্রৌঢ় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে? কিন্তু কি জিজ্ঞেস? একটি মেয়ের নাম? সে আমার কে হয়? যদি আমাকে লম্পট হিসেবে? মহা মুশকিল দেখছি!

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরে বাজারের দোকানে। খেয়ে পদমজীর ঘরে ঘুম। কিন্তু গাঢ় ঘুম হয় না। অনেক রকম স্বপ্ন, এলোমেলো। একবার অনুরাধাকেও। সেই দুঃখ ও রাগ মেশানো মুখ। অনুরাধার সঙ্গে দেখা হলেও ও কি আমাকে চিনতে ? কি জানি, ভয়। কেনই বা চিনবে ? আমি ওর কে ? এমনকি ভালো মতন আলাপ তো।

বিকেলে আবার। জানি পণ্ডশ্রম, তবুও নেশার মতন। পৃথিবীতে আমার এখন একমাত্র কাজ অনুরাধা বসুমল্লিককে খুঁজে বার করা। না হয় শুধু একবার তাকে দেখেই। হয়তো সে এখানে নেই। তবু এখানে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সেই জন্যই শহরটা চুম্বকের মতো।

ঠিক সন্ধের আগে আমি যুবকটিকে হঠাৎ। সে একটা ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছিল। আমি তাকে এক পলক দেখেই। কিন্তু সেও কি আমাকে ? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে।

আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে দুম দুম যেন বাইরের লোকও শুনতে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে নিরাশ হবার ঠিক পরেই এই আশাতীত। এত বেশি আনন্দ যে অনেকটা ভয়ের মতন। দারুণ ভয় ও দারুণ আনন্দের প্রতিক্রিয়া যেন একই রকম।

ডাক্তারখানায় কেন ? কার অসুখ ? অনুরাধার ? তা হলে সে বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই। কিছুতেই দেখা হবে না। আমি যদি ডাক্তার হতাম, ইস!

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যুবকটি আবার একটি দোকানে। আমি খানিকটা দূরে। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। যেন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা। সিগারেট ধরিয়ে বার বার আড়চোখে।

যুবকটি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই, আমিও তার পেছন পেছন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। হয়তো যুবকটি আমাকে দেখলেও। ট্রেনের কামরার সঙ্গীদের কে মনে রাখে। আমি রেখেছি, আমি তো রাখবই!

আসলে আমি সারাদিন খুবই বোকামি। একটি মেয়ের বদলে একটি ছেলেকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ! আমি যদি ছেলেটিকেই কোনো না কোনো দোকানে। কিংবা বাজারে। একটা ছেলে তো আর সারাদিন বাড়িতে। আসলে ছেলেটির কথা আগে আমার মনেই। সব সময় অনুরাধার মুখ।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে যুবকটি যে বাড়ির সামনে আসে, সেই বাড়ির কাছ দিয়ে আমি আগে অন্তত পাঁচ ছ' বার। এই তো সেই বাড়িটা! সেই চৌধুরী কুঠী। কুকুরের মতন শুঁকে শুঁকে আমি তাহলে ঠিক বাড়িতেই। ইস একটা বেলা শুধু শুধু।

বাড়িটা হলুদ রঙের একতলা। সামনে ছোট বাগান। বেশ পুরোনো আমলের

বাড়ি, মোটা মোটা থাম। গেটটা ভাঙা। রাত্তিরে যে-কোনো চোর অনায়াসেই। বাড়িটার চারপাশে অবশ্য দেওয়াল।

সামনেই রাস্তার ওপাশে মাঠটা ঢালু হয়ে। একটা বিরাট তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ওপাশে হেলান দিয়ে একজন মানুষ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার পা ব্যথা করে। অস্বস্তি ও লজ্জা।

অন্ধকারে কোনো দৃশ্য নেই। চোখের সামনে শুধু পাতলা বা গাঢ়। মাঠের দিকে চেয়ে থাকার কোনোই মানে। শুধু বাড়িটাতেই আমার। বাড়িটা নিস্তব্ধ এবং বাইরের দিকে আলো নেভানো। কতক্ষণ আর কতক্ষণ এইখানে! এবং কি ভাবে? কি ভাবে আমি অনুরাধাকে? কোনো উপায়ই তো চোখে। অস্বস্তিতে শরীরটা কেন কাঁপার মতন। বুকের মধ্যে ব্যথার মতন, গলার কাছে বাষ্পের মতন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য আমি আরো বেপরোয়া হয়ে। সন্তর্পণে চোরের মতন গেট খুলে বাগান পেরিয়ে। সারা বাড়ি শব্দহীন। এ বাড়িব লোকেরা কি, সন্ধেবেলাতেও কেউ বেড়াতে বেরোয় না?

রীতিমত অন্ধকার, তার মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির পেছন দিকে। পায়ে কিছু একটা লাগলে আমি নিজেই চমকে। যদি ধরা পড়ি তা হলে কি? আমি অনুরাধার গোপনীয়তার ভাগ নিতে।

দাঁড়িয়ে থাকি, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ। সত্যিই এখন গা কাঁপছে। ফিরে যাব, ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সাহস। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিরাট শব্দ করে দরজা খুলে একজন কেউ বাইরে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ কি কোনো রকম সন্দেহ?

ভারী গলায় একজন বলল, এই, দুটো চেয়ার দিয়ে যা তো বাইরে! জয়ন্ত, জয়ন্ত, এদিকে এসো!

—আসছি কাকাবাবু!

—এখানে বসা যাক। বেশ হাওয়া দিয়েছে!

আমি প্রায় মড়ার মতন। লোক দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে। এখন আমি কি করে? বাড়িটার চারদিক পাচিল ঘেরা। পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে যদি শব্দ-টব্দ।

বাড়ির দেওয়ালে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। পুরোনো দিনের নোনাধরা দেওয়াল। ইচ্ছে করে গালটা ছোঁয়াই এবং কাঁদি। এরকম বোকামি কি কেউ? যদি এ বাড়িতে কুকুর?

লোক দুটি বাইরে বসে সশব্দে গল্প। অপরজন জয়ন্তর কাকা। তারই বাড়ি বোধহয়। তিনি জয়ন্তকে মুরগিপালন বিষয়ে কিছু। অনেকদিন পোলট্রি করেছেন মনে হয়। জয়ন্তর হুঁ হাঁ শুনলে বোঝা যায় তার কোনোই আগ্রহ।

যাক, তা হলে এখনো সন্দেহ করেনি কিছু। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,

যতক্ষণ না ওরা আবার ভেতরে। সে কতক্ষণ কে জানে।

খানিকটা দূরে একটা জানলায় আলো। আমি পা টিপে টিপে সেই দিকে। জানলার নিচের দিকটা বন্ধ, ওপরের দিকটা খোলা। আমার মাথার চেয়েও উঁচুতে। ডিঙি মেরেও কিছুতেই। অথবা যদি দেওয়াল বেয়ে। না, না, তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি। একটা ইঁট যোগাড় করতে পারলেও।

ভাঙা দেওয়ালে অনেক আলগা ইঁট। অন্ধকারের মধ্যে খুব সাবধানে একটা। তারপর সেই ইঁটের ওপর পা দিয়ে।

এক পলক দেখেই নিচু করে নিই মাথা। খাটের ওপর সেই মেয়েটি। অনুরাধা। সত্যি? না স্বপ্ন? খুব কাছে গিয়ে, চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে। তারপরেই আবার সরে। চোখ বুজে একটুক্ষণ হৃদয়ঙ্গম। হ্যাঁ, সত্যিই তো অনুরাধা। অসুস্থ কিনা জানি না। বুকের ওপর বই খোলা। আজ ফ্রক নয়, শাড়ি। কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যেন শাড়িতে মোড়া এক গুচ্ছ চাঁপা ফুল। ওই এক ঝলকেই আমি দেখেছি তার কোমর। বিলিতি ছবির মতন। যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সুন্দর অনুরাধা।

এখানে আমি চোরের মতন। সত্যিই কি চোর? কিছু তো নিতে আসিনি। আমাকে রূপচোর যদি বলে। সেটা কি দোষের? জানি না। ওকে আর একবার দেখার জন্য আমার বুকের মধ্যে সাংঘাতিক।

আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা ছিল। হঠাৎ এই সময় তা ভেদ করে বেরিয়ে এল লক্ষ্মীছাড়া চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হতেই আমার ভয়। এতক্ষণ হাত-পাগুলো অন্ধকারের মধ্যে। এখন নিজেকেই নিজে দেখতে পাই।

কোথায় লুকোবো? যদিও এখনো আর কেউ। একটা ব্যাপার বুঝে গেছি, এ বাড়িতে কুকুর-টুকুর অন্তত। উঃ, যদি কুকুর থাকত, তাহলে এতক্ষণ আমাকে সাধারণ চোরের মতন।

অদূরে বারান্দায় লোক দুটি এখনো কথাবার্তায়। এখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। কী করে যে মুরগিপালন থেকে বিদ্যাসাগরমশাই প্রসঙ্গে? অ্যাট্রোশাস! জয়ন্তের কাকা বোঝাচ্ছেন, কার্মাটারে বিদ্যাসাগরমশাই সাওতালদের কাছ থেকে ভুট্টা কিনে আবার তাদেরই সেইগুলো খাওয়ার জন্য। সেই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে... উঃ। কী ভুল! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার কার্মাটারে। আমি চেঁচিয়ে ওনার ভুল শুধরে? তাহলে হয়েছে আর কি!

আরো কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালা জানলার ওপাশেই অনুরাধা। ওর সঙ্গেও কোনো কথা। আমার অধিকার নেই। দেখার? আবার পা টিপে টিপে জানলার কাছে। ইঁটের ওপর আঙুলের ভর দিয়ে। জানলার শিক ধরতে সাহস হয় না। দেওয়ালে।

অনুরাধার কি অসুখ ? নীল শাড়ি, অনাবৃত বাহু, পায়ের দুটি পাতা, কোমরের কাছে খানিকটা নগ্ন। বুকে ঢেকে রাখা দুটি স্থলপদ্ম। আমি চোখ দিয়ে শুধু এই সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে যে বিষাদ। ট্রেনে আমি ওকে শয়ান অবস্থায় কাঁদতে। একটি কিশোরীর চাপা দুঃখের মতন এমন তীব্র, মধুর, স্পর্শকাতর আর কী আছে পৃথিবীতে ? কিশোর বয়েসে আমারও এরকম কতবার।

দারুণ লোভ হচ্ছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে। জানি, তা সম্ভব নয়। তবু লোভ। জানলা দিয়ে ওর নাম ধরে ? নিশ্চয়ই চমকে উঠে, ভয় পেয়ে। তা ছাড়া আমি ওর কে ? ও আমার এত আপন।

নিশ্বাসও বন্ধ করে থাকি। যাতে কোনোরকম শব্দ। দেখে দেখে আশ মেটে না। যদি একবার পাশ ফিরত, তাহলে মুখখানা আরো ভালো করে। ওর মাথা জানলার দিকে। আঙুলগুলো সোনার মতন, ওই আঙুলে হাজারবার ঠোঁট বুলোলেও।

অনুরাধা বইয়ের একটা পাতা ওল্টাল। অর্থাৎ জেগেই। তাহলে এখন কাঁদছে না। বই পড়তে পড়তে এখনো প্রায়ই আমার চোখ দিয়ে জল। সে অন্যরকম কান্না।

পায়ের তলা থেকে ইঁটটা পিছলে। একটি বিশ্রী শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে বসে পড়ার জন্য। তারপরই প্রায় উ করে চেঁচিয়ে। কোনো রকমে মুখ চেপে। খানিকটা কাঁটা তার, এমন খোঁচা মেরেছে উরুতে। আস্তে আস্তে তারটা সরিয়ে।

অনুরাধা শব্দ শুনেছে। স্পষ্ট বুঝলাম খাট থেকে ও। তারপর জানলার কাছে। আলোর মাঝখানে ওর সিলুয়েট। সামনের দেওয়ালটা যেন স্ক্রিন। জানলার শিকগুলোর জন্য হঠাৎ মনে হয় কারাগারে এক বন্দিনী। ও কি চিৎকার করে ? তা হলেই তো আমি। না, না, অনুরাধা, আমি চোর নই, আমি তোমার শত্রু নই, তুমি আমাকে।

একটুক্ষণ ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই। চুলগুলো খোলা। হাত দিয়ে কপালের চুল। চিৎকার করে উঠল না শেষ পর্যন্ত। আসলে রাত তো বেশি হয়নি, এই সময় কেউ সাধারণত চোরের কথা।

আবার সরে গেল জানলা থেকে। আর না। এবার আমাকে পালাতেই। আর বেশি ঝুঁকি নিলে।

কিন্তু কি করে ? সামনে এখনো লোক দুটি। সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জয়ন্তর কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, রঘু, জল দিয়ে যা।

জল ? সন্ধেবেলা জল। শুধু জল ? তাহলে তো আরো কতক্ষণ কে জানে।

সুতরাং পাঁচিল টপকেই। খুব বেশি উঁচু নয়। আমার মাথা সমান। মাঝে মাঝে

আইভি লতা। শব্দ না করে কোনোক্রমে। খুব আস্তে আস্তে অনুরাধার জানলার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পাচিলে ধরবার মতন কিছুই নেই।

এক হতে পারে, বাড়ির পেছন দিকে যদি কোনো খালি জায়গা। আমি পাচিলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে। বাড়ির পেছন দিকেও প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে রান্নাঘর। ভাগ্যিস আমার উল্টোদিকে। রান্নাঘরে আলো, সেখানেও এক রমণী। বারান্দায় দুটি জ্বলজ্বলে চোখ। ভয়ের কিছু নেই, একটা বেড়াল। বেড়াল তো আর মানুষ দেখলে কুকুরের মতন।

সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে। এবার পায়ের নিচে মাটি নরম। চটিজোড়া খুলে আগেই হাতে। এখন যদি এক দৌড়ে। সামনের দিকটা ফাঁকা মতন।

একটু দৌড়োতে গিয়েই আবার পায়ে কি যেন। নিচু হয়ে দেখলাম গোলাপ কাটা। এবং অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় একটা বাগান। অনেক গোলাপ ও বেলফুলের চারা। অনেক ফুল এখানে। গোলাপের রঙও শাদা। কিংবা জ্যোৎস্নায় রঙ বদলেছে। একটা গন্ধের ঢেউ।

কাটাটা না বার করলে। হঠাৎ আমি কীরকম বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফুলের বাগানে এক চোর। তার পায়ে কাঁটা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ছে তার মাথায়। কোন নিয়তি আমাকে এখানে? আমি কি এর যোগ্য? আমার চোখ জ্বালা করে ওঠে। আমার জীবনে কত ব্যর্থতা, কত কিছুই পাইনি, তবু কেন এই অপরূপ কুসুমগন্ধ।

কাটাটা খানিকটা ভেঙে গিয়ে ভেতরে। একটা গোল মুখওয়ালা চাবি পাওয়া গেলে। যাই হোক, এখন আর কি করা। এইভাবে এখানে কতক্ষণ? একটা বেলফুলের গায়ে টোকা দিয়ে তার শিশির। একটা গোলাপের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কাকর ঠোঁট।

উঠে দাঁড়াতেই দেখি উল্টো দিক থেকে একটা লোক। খালি গা, মালকোচা ধুতি।

—কে?

এক মুহূর্ত আমি চুপ করে। বাগানের ওপাশে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। এক পাশে একটা বাঁশের গেট। খোলা। ঐখানে আমার মুক্তি।

—কে, কে ওখানে?

উত্তর না দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়।

—আবার এসেছে। দাদাবাবু। দাদাবাবু।

লোকটাও দৌড়ে গিয়ে গেটের কাছে। আমি ডান দিকে বেঁকে। যদি আর কোনো ফাঁকা জায়গা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু। হারামজাদা আবার এসেছে।

[illegible] পালাতেই হবে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই একঝাঁক মরগি

কক্ কক করে। চমকাবারও সময় নেই। ওদিকে জয়ন্ত আর তার কাকাও। হাতে লাঠি আছে কি?

—ধর, ধর ব্যাটাকে!

খালি গা লোকটা এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ডাণ্ডা। ওদিকে আর কোনো সুবিধে হবে না। আমি একদম মার সহ্য করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

অতএব সামনের দিক দিয়েই আবার ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে। যত ইচ্ছে কাঁটা ফুটুক। পায়ের নিচে কি দু'একটা গাছের চারা? তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

জয়ন্ত আর কাকা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ধরার জন্য। খালি হাত। ওদের যে-কোনো একজনকে এক ধাক্কা দিয়ে। এখন বারান্দাতে অনুরাধাকে।

যেন একটা ইঁদুরকে তিনটে বিড়াল। আমি এদিক ওদিক ছুটেও ফাক পাচ্ছি না। অনুরাধাই একটা দরজার খিল এনে জয়ন্তর দিকে।

আমি হঠাৎ বাগানের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আমাকে মারবেন না! আমি চোর নই!

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ঐ কথাই আবার ইংরেজিতে। আমার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে।

জয়ন্তর কাকাই সাহস করে এগিয়ে এসে আমার কলারে হাত। খুব রাগী মুখ। যদি চড় মারে, সেইজন্য আমি সাবধান হয়ে।

—কে তুমি? এখানে কী করছ?

—বলছি, বলছি।

একটু হাঁপাচ্ছিলাম। দম নেবার জন্য একটু সময়।

—দয়া করে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলুন!

—কে তুমি?

—ভেতরে গিয়ে বলব!

ভেতরে নয় বারান্দা পর্যন্ত। রান্নাঘর থেকে মহিলাটি, ভেতর থেকে আরো একজন মহিলা। খালি গা লোকটা ডাণ্ডা হাতে আমার পাশে। সে জানাল, এ তো সে হারামজাদা নয়।

আরো একজন নিয়মিত চোর আছে। ওদের বোঝানো দরকার, আমি জীবনে এই প্রথম। জয়ন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। অনুরাধা এখনো আমার মুখটা ভালো করে। ও কি চিনতে পারবে না?

চটি জোড়া হাত থেকে নামিয়ে আমি জয়ন্তর কাকাকে খানিকটা হুকুমের সুরেই, জামাটা ছেড়ে দিন।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস, কে আপনি?

তুমি থেকে আপনিতে। এটা নিশ্চয়ই ইংরিজির জন্য।

—দয়া করে জোরে কথা বলবেন না! আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে চলে যাব।

—ইচ্ছে করে? এটা কি বাজার?

—আপনারা বাঙালি বলেই।

—বাঙালি তো কি হয়েছে?

—বলছি, একটু সময় দিন।

—সময় দিতে হবে? তুমি কোন লাটসাহেব?

জয়ন্তর কাকা আবার মারমুখী। ইনি আমার ইংরিজি শুনেও তেমন গুরুত্ব। ছেলেছোকরাদের কেউই আজকাল। বয়েসটাই অপরাধ।

—এখানে ঢুকেছ কেন?

—পুলিশের হাত থেকে বাচবার জন্য। একটু আগে আপনাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ি আগে দোতলা বাড়ি থেকে একটা লোককে বেরুতে দেখেছি। আই বি'র লোক। আমাকে দেখলেই ধরবে। তবে আপনাদের আগেই বলে রাখছি আমি চোর বা ডাকাত নই।

অনুরাধা এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে। মুখটা ভালো করে দেখে, ওঃ!

আমি সামান্য হেসে, হ্যাঁ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে, ট্রেনে! কবে? রমু, তুই একে চিনিস?

অনুরাধা ঘাড় নেড়ে এবং মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করে জানাল, না।

আমার শেষ আশাও। চিনতে পারল না? অথচ আমি যে ওকে সারা জীবনের মতন। আমার ভয় পাবার কথা ছিল, তার বদলে অভিমান।

জয়ন্ত আমার দিকে ফিরতেই আমি হাত তুলে। তাকে আর কথা বলতে দিই না।

—এক গেলাস জল পেতে পারি? খুব তেষ্টা পেয়েছে।

জয়ন্তর কাকা বললেন, রঘু জল এনে দে।

—আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি!

একথায় জয়ন্ত যেন একটু চমকে। আবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর জিজ্ঞেস, আপনার নাম কি?

—অশেষ মজুমদার।

পায়ে কাঁটাটার ব্যথা। একটু বসতে পারলে। রঘু জল এনে সামনে উঁচু করে। শুধু একটা ঘটি। গেলাস নেই, উঁচু করে আলগোছে খেতে হবে নাকি, ভিখিরিরা লোকের বাড়িতে এসে যেমনভাবে। সেই রকমভাবে খেতে গিয়ে জামা-টামা

একেবারে ভিজিয়ে।

খুড়োমশাই এবার রঘুকে ধমক, গেলাস আনতে পারিসনি!

—ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে।

তবু খুব তৃষ্ণার্তের মতন অনুরাধার দিকে একবার। ওর চোখে চোখ। কী ঐ চোখের গভীরে? মানুষ এখনো কি শিখেছে চোখের প্রকৃত ভাষা!

—আপনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন কেন?

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আই বি'র লোকটিকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে।

—কোন দিক দিয়ে এলেন?

আমি বাগানের দিকে গেটের দিকে আঙুল।

—ওদিকে তো রাস্তা নেই, ওদিকে তো মাঠ।

—পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে। সামনের বারান্দায় আপনারা বসেছিলেন তো।

—কতক্ষণ আগে?

—মিনিট পনেরো। পায়ে কাঁটা না ফুটলে এতক্ষণে হয়তো চলেই যেতাম।

কাঁটা ফোটার কথাটা কেউই গ্রাহ্য। জয়ন্ত আর তার কাকা চোখাচোখি। যেন আরো কিছু প্রশ্ন। মহিলাটি এবার সেটা।

—দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের ভয়ে পালাবে কেন?

কাকা বললেন, আমিও তো সেইটাই বুঝতে পারছি না।

কাকাকে উত্তর না দিয়েই আমি ভদ্রমহিলার দিকেই। তাঁর মুখে খানিকটা রাগ। আমি কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে, আপনি জানেন না। কেন ছেলেরা পালায়? এটা উনিশশো সত্তর সাল, তাও একথা জিজ্ঞেস করছেন? কলকাতায় থাকলে আমি এতদিনে মরে যেতাম।

অনুরাধা এবার জিজ্ঞেস, আপনি তপন আচার্যকে চেনেন?

—চিনতাম। সে মারা গেছে!

—কবে?

মনে মনে খানিকটা হিসেব। কবে কলকাতা থেকে ট্রেনে? তার আগের পরশুদিন।

—১৪ই মার্চ। ওর গুলি লেগেছিল।

অনুরাধার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে জ্বর। এর জন্যই ওষুধ আনতে জয়ন্ত। অনুরাধা এক পায়ের আঙুল দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চেপে ধরেছে।

—তপন আমার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আমার বন্ধুর মতন ছিল। চমৎকার ছেলে। হীরের টুকরো ছেলে—

জয়ন্ত আমাকে থামিয়ে অনুরাধাকে, এই রমু, তুই ঘরে যা—।

—না, কেন?

—তোর এখনো গায়ে জ্বর, শুয়ে থাক, উঠে এসেছিস কেন?

—কিছু হবে না।

জয়ন্ত এবার আমাকে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

ওদের শোওয়ার ঘরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তারপর বসবার ঘরে। জয়ন্তর কাকা চাইছিলেন বাইরের বারান্দায়। আমি কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা স্পষ্ট।

অনুরাধা এ-ঘরে আসেনি। তিনজন তিনটে চেয়ারে। জয়ন্তর কাকা বাইরের বারান্দা থেকে তার গেলাসটা। গেলাসে শুধু জল নয়।

—আপনি চা খাবেন?

—খেতে পারি।

—তপন আচার্য আমাদের বিশেষ চেনা ছিল।

এখন আমার পক্ষে নীরব থাকাই। মনে মনে আমি তপন আচার্যর চেহারাটা। হীরের টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাধার মতন মেয়ে যখন তার জন্য।

জয়ন্তর কাকা খানিকটা মাকশোষের সঙ্গে, কেন যে ছেলেরা এরকম পাগলামি শুরু করেছে? এরকমভাবে কি দেশটা বদলানো যায়?

জয়ন্ত— আমারও মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল পথ। শুধু শুধু কতকগুলো ভালো ভালো ছেলে -

আমি তখনও নীরব। আমি অপরাধী। আমি ওরকম পাগলামিও তো। আমাকে পুলিশে কখনো। তবু আমি আন্তরিকভাবে তপনের বন্ধু হয়ে যেতে।

শুধু চা নয়, সঙ্গে মিষ্টি। সেই বাগী মহিলাই।

জয়ন্ত আবার আমাকে, এখানে কোথায় উঠেছেন?

—কোথাও না।

—তাহলে হঠাৎ কীভাবে?

—ডেহরি অন-শোনে ছিলাম। সেখানে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মনে হলো, যদি কলকাতায় খবর চলে যায়। আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেছি। তারপরেই আই বি লোকটাকে রাস্তায়—ও যে আই বি'র লোক সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট, কলকাতায় দেখেছি, মুখ চেনা।

—আপনি এখানে থাকতে পারেন।

—না, না, ঐ লোকটা যখন এখানে আছে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে

যেতেই হবে।

—আপনি তখন বললেন, ট্রেনে আগে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আপনারা যখন কলকাতা থেকে আসছিলেন, আমিও সেই কামরায় ছিলাম। আমি ঐ মেয়েটিকে, বোধহয় আপনার বোন, ওকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখেছিলাম।

একটা সত্যি কথা বললে অনেক মিথ্যের পাপই। কথাটা বলতে পেরে আমি অনেকটা হালকা। আমি অনুরাধাকে আগে দেখেছিলাম, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার। আমার যা পাবার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

যেন পুরোনো পরিচয় বেরিয়ে পড়ল, তাই আড়ষ্টতা অনেকখানি। জলের গেলাস হাতে মহিলা তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আরো যেন কারা—

—ওরা আমার কেউ নয়।

জয়ন্ত এবার ঈষৎ হাস্যে, রঘু আপনার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসালেই হয়েছিল আর কি।

জয়ন্তর কাকা ঠোঁট থেকে গেলাস নামিয়ে, এক ব্যাটা চোর যে এখানে প্রায়ই আসে। মুরগি চুরি করে।

—আমাকে দেখে কি মুরগিচোর।

—হাঃ হাঃ হাঃ, না, না, তবে অন্ধকারের মধ্যে তো বোঝা যায় না।

আরো একটু পরে জয়ন্ত, আমার দিকে তাকিয়ে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন?

—জানি না।

যেন আমি চির-পলাতক। এটা আমার ছদ্মবেশ। তবু মনে মনে আমি সেই রকমই। এক এক দিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

—কিসে যাবেন?

—ট্রেনে। রাত্তিরে কখন ট্রেন আছে

জয়ন্তর কাকা ফতুয়ার পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে। অনেকদিন আমি এ-রকম ঘড়ি। কাকার বদলে ওঁর ঠাকুর্দা হওয়া উচিত ছিল।

একটা তো রাত্তির সাড়ে আটটায়। আর মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই। অবশ্য এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিনই লেট করে। আর একটা ট্রেন রাত তিনটেয়।

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। আর বেশিক্ষণ এদের আতিথেয়তা।

—আমি সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাব।

—কেন, রাতটা থেকে যান এখানে। বাড়ির মধ্যে কেউ আসবে না। এখানে

এখনও অতটা—হয়নি। নিরিবিলি জায়গা।

—না, আমার পক্ষে রাত্রে যাওয়াই সুবিধে।

—বসুন, কিছু খাবার-টাবার খেয়ে যাবেন। বললাম তো, ট্রেনটা লেট করে।

—এই তো চা মিষ্টি খেলাম।

—ভাত হয়ে গেছে বোধহয়।

—না, ক্ষমা করুন। আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। আমাকে যেতেই হবে।

—তপন দেড় মাস বাড়ি-ছাড়া ছিল। কখন কী যে খেয়েছে না খেয়েছে।

—আমি জানি, তপন মরার সময় একটুও কষ্ট পায়নি। এক সেকেন্ডেই।

—বমুর খুব বন্ধু ছিল। ওর মনে এমন ধাক্কা লেগেছে।

—আমি এখন যাই।

দরজার কাছে অনুরাধা। আগের কথাগুলো কি ও?

অনুরাধার হাতে খানিকটা তুলো ও একবাটি গরম জল। অন্য দু'জন অবাক চোখে। অনুরাধা আমাকে, আপনার পায়ের কাঁটাটা বেরিয়েছে?

আর কেউ মনে রাখেনি। শুধু অনুরাধাই।

—না, খানিকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে।

—কই দেখি? আমি বার করে দিচ্ছি।

আমি একেবারে আঁতকে। তা হয় কখনো? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

—না, না, তার কিছু দরকার নেই। পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

অনুরাধা ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখল একবার। তারপর আবার মুখ নিচু করে, অনেকটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা আপনি আপনি বেরোয় না।

অন্য পুরুষ দু'জন একটু অস্বস্তিতে। ঠিক কী করা উচিত। তারপর জয়ন্তই উঠে এসে, দেখি, আমাকে দেখান তো, কোথায় কাঁটা ফুটেছে।

যাতে সেটা মিথ্যে না ভাবে, সেই জন্যই আমাকে সেটা তুলে। ঠিক মাঝখানে কাঁটার মুখটা।

জয়ন্তই সেটা তুলে দেবার চেষ্টা করার জন্য। তাকে বাধা দিয়ে অনুরাধা, তুমি সরো ছোড়দা, আমি তুলে দিচ্ছি।

—বমু, তুই ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে বসলি কেন? এই টুলটা নে না।

—কিছু হবে না। দেখি, আপনি ওই চেয়ারে বসুন।

এটা আমার প্রতি হুকুম। আমি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জয়ন্তর কাকা তখন। বসুন না। কাঁটাটা তুলে ফেলাই ভালো। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত ঘা হবে।

এবার আমাকে চেয়ারে বসতেই। আমার বাঁ পা থেকে চটি খুলে। অনুরাধা

তার নরম নবনী-হাতে আমার বিশ্রী ধুলো-মাখা পায়ের পাতা তুলে নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে। গরম তুলো ভিজিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে মুছতে জানতে চায়, ব্যথা লাগছে?

এই যদি ব্যথা হয়, তবে সুখ কার নাম?

তবু আমি চোরের চেয়েও বেশি আড়ষ্ট মুখ করে। এবার সত্যিই আমি কিছু চুরি। এ তো আমার পাওনা নয়।

পরম যত্নে অনুরাধা আমার পা-টা রেখেছে ওর কোলে। তারপর মুখ ঝুঁকিয়ে কাঁটাটা। আমি শুধু ওকে দেখতে এসেছিলাম। তার বদলে এই স্পর্শ। কী মসৃণ চিবুক, গভীর নদীর স্রোতের মতন কাঁধ, পিঠের ওপর লুটানো বর্ষার মেঘের মতন চুল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই কি অলীক? আমি কি সত্যিই এখানে এই ঘরে?

কাঁটাটার জন্য সবাই উদগ্রীব। অনুরাধার মুখ দেখলে মনে হয় ঐ কাঁটা যদি আজ সারা রাতেও না ওঠে, তা হ'লেও।

আমি আত্মা মানি না। তপন আচার্য কি একেবারেই হারিয়ে? কোথাও কি তার আত্মা? তপন, তুমি কি কোথাও আছ? তাহলে এসো, দেখে যাও, এই সেবা। এই সেবা আমার জন্য নয়। তপনের কোনো বন্ধুর জন্য, আসলে তপনের জন্য। অনুরাধা যার পা থেকে কাঁটা তুলছে, সে ঠিক তোমারই মতন আর একজন, আমি নয়, আমি ছদ্মবেশী।

—এই যে উঠেছে!

অনুরাধার মুখে যে হাসি ফুটেছে, ওর তুলনা কি সে? ঐ ওষ্ঠের ঐ হাসিটুকু আমাকে চিরকালের জন্য দেবে? আমি ছবির মতো বাঁধিয়ে।

ওর চোখে চোখ রেখে আমি নীরব প্রশ্ন, তুমি আমাকে ট্রেনে দেখেছিল, চিনতে পারনি? মধ্যরাত্রে তুমি দরজা খুলে।

অনুরাধা নীরব চোখে উত্তর, হ্যাঁ, পেরেছি!

—তখুনি আমি হাত বাড়িয়ে, দাও, কাঁটাটা আমাকে দাও।

সেটা হাতের তালুতে নিয়ে। বেশ ধারাল। একটা কাগজে মুড়ে সেটা বুক পকেটে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলে, বাঃ একটুও ব্যথা নেই। দৌড়োতে পারব। আমি চলি।

ওই রকম সেবা নেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ থাকতে আরো লজ্জা। যদি ছদ্মবেশটা হঠাৎ। চির-পলাতক তো এক জায়গায় এতক্ষণ সময় কখনো।

অনুরাধা অবাক হয়ে, এক্ষুনি যাবেন?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

জয়ন্তর কাকা, যদি অবশ্য সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতেই হয়—

—হ্যাঁ যাই।

—সামনে রাস্তা দিয়ে যাবেন।

—যদি পেছনের দিক দিয়ে যাই? ট্রেনটা লেট করে।

—তাহলে অবশ্য একটা মাঠ পেরুলেই বাজার ে

দরজার কাছে গিয়ে আবার আমি দাঁড়িয়ে শুধু

কথাটা বলার জন্য এসেছিলাম। এই তো সেই ১ জানার! আমাকে যেতেই

আপনাদের একটা কথা জানা দরকার। আমি তপন

চিনি। শেষ সময়েও তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। মৃত্যুর খেয়েছে না খেয়েছে।

পারিনি। একবারও ভেঙে পড়েনি। সে ছিল বীর। তার ন। এক সেকেন্ডেই।

হোক। সে ছিল খাঁটি আদর্শবাদী। সে মানুষের ভালো চে ছে।

গর্ব হওয়া উচিত। আমি যখনই তার কথা ভাবি...।

কথা শেষ হলো না, অনুরাধা এর মধ্যেই কান্ন ?

কী অসম্ভব কাতর কণ্ঠস্বর। তবু বোধহয় এর মধ্যে জল। অন্য দু'জন অবাক

সামান্য মিথ্যের জন্য যত পাপ হয় হোক। আ গটাটা বেরিয়েছে?

ওরা এল আমাকে এগিয়ে দিতে।

আদর খাচ্ছিল বাগানটা। এবার আমি গেছে।

গেটের কাছে এসে জয়ন্তর কাক

— এই কোনাকুনি চলে যান।

— আচ্ছা, চলি নো? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

সত্যিকারের পলাতকের মতন আ পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

তে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখল

আমাকে পেছন দিক থেকে ছুলো। ১ কটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা

একটু বাদেই আমি অন্ধকারে ওদের

পেছন ফিরে ফিরে ওদের। বাগের গেটের কাছে তিনজ ন্ত। তারপর জয়ন্তই

একটু বাদে আর কিছুই।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমি একসময় আবার একা। মাঝখানে

অনবরত ছুটতে ছুটতে। আমি পলাতক। সে কখনো থাকে না। তা

মাঠ-ঘাট ভেঙে অনবরত। মাঝখানের এই একটা ঘণ্টা কি স্বপ্ন?

কাঁটাটা আবার। একটু আগে এই কাঁটাটা আমার শরীরের মধ্যে। কাঁটাটি তো সা

ফুলের কাঁটা। কাঁটা আছে, ফুলও ছিল।

টি খুলে। অনুরাধা

BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com